লীলা মজুমদার

কুকুর এবং অন্যরা



রবীন্দ্র পুরস্কার ও ভারত সরকারের শিশু-সাহিত্য
এবং দেশিকোত্তম পুরস্কার প্রাপ্তা

লীলা মজুমদার

কুকুর এবং অন্যরা

বিমলারঞ্জন প্রকাশন
৮।১সি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ :
শুভ ১লা বৈশাখ, ১৩৯১ সাল

প্রকাশক :
শ্রীবিমলারঞ্জন চন্দ্র
৮।১সি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রাকর :
শ্রীযুগলকিশোর রায়
শ্রীসত্যনারায়ণ প্রেস
৫২এ, কৈলাস বসু ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

অলংকরণ :
অঞ্জন
প্রচ্ছদ :
গণেশ বসু

মূল্য : দশ টাকা মাত্র



চিঁ-হুয়ী

শীতের শেষে শ্যামবাটিতে যদি কখনো যাও তো আর ফিরতে চাইবেনা। ওখানে কলকারখানা আপিস আদালত দোকান্-পাটের শব্দ পৌঁছয় না বটে, কিন্তু গাছপালারা কথা বলে। ভোর না হতেই জানলা দিয়ে শুনতে পাই শির শির সর সর ঝর ঝর পড় পড় ওঠ্, ওঠ্, উঠে পড়্। বেরিয়ে দেখি গাছ দুলছে, পাতা নড়ছে। উপরে তাকিয়ে দেখি ভাঙা চাঁদ ঝুলছে, ছেঁড়া মেঘ উড়ছে। নিচে তাকিয়ে দেখি দাদুর বাড়ির গেটের বাইরে নেড়ি কুত্তোরা খিদেখিদে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে, ঢুকতে পারছে না। চারদিকে জালের বেড়া এতটুকু ফাঁক নেই যে গলে আসবে।

আর এলেই বা কি ? দাদুর মালী বুধন্নু অমনি চ্যালা কাঠ নিয়ে তেড়ে যাবে। একটা কুকুর-বাচ্চা পেলে বেশ হত। গাছের আড়াল থেকে গুবগুবে পাখি বলল গুব্, গুব্, গুব্, অর্থাৎ কিনা চুপ চুপ চুপ। ক্যানালবাবুর বাড়ির ছাদ থেকে ঘুঘু পাখিরা বলল—কেষ্টঠাকুর ওঠ ওঠ ওঠ! অর্থাৎ কিনা আমার দাদুকে ডেকে বলছে দ্যাখ্ দ্যাখ্ দ্যাখ্ দুষ্টু কথা ভাবছে! বেশি খায় না কুকুর-বাচ্চারা। আমার খাবার রুটি বিস্কুট দুধের খানিকটা নিলেই হয়ে যাবে। গাছের ডালে দোয়েল শিস্ দিল্, শ্যামা ঘাড় বাঁকাল, ফিঙে ল্যাজ নাচাল। দুয়ো দুয়ো দুয়ো! কুকুর-বাচ্চা আনতে ভয় পায়।

ট্রেনের শব্দ শোনা যায় এখান থেকে। দুধ খেয়ে দিদিভাইকে বললাম, 'বাঁধে চড়ে রেলগাড়ি দেখব। এখান থেকে শুধু ধোঁয়া দেখি।

দিদিভাইয়ের কত ভাবনা, 'গড়িয়ে পড়ে যাবি না তো ? পায়ে যদি কাঁটা ফোটে ? নেড়িকুত্তো যদি কামড়ায় ? ছেলেধরায় ধরে নেয় ?'

তারপর আমার হাঁড়িমুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'আচ্ছা যা। বেশি দূরে যাস্‌নি। ঐ খেজুরগাছ তিনটে অবধি যাবি আর অচেনা লোকের সঙ্গে কথা বলবিনে।' আরেকটু ভেবে বললেন, 'বরং শুক্‌না সঙ্গে থাক।

আমি বললাম, 'বেশ'।

শুকনা হল বুধনার ছেলে। আবার অর্ধেক রোগা অর্ধেক বেঁটে, ভূতের ভয়ে কুয়োর পাড়ের বেলতলায় যায় না। দিদিভাই শ্যামলাকে একটা লাঠি নিয়ে যেতে বললেন। নেড়িকুত্তো তাড়াবার জন্যে। যেই বট গাছের আড়াল হলাম, সেটা আমি নিয়ে নিলাম। সড়াৎ সড়াৎ করে আকন্দ গাছ ভাঙতে ভাঙতে চললাম। আকন্দফুল বড্ড বিষ, চোখে লাগলে অন্ধ হয়। খালি খালি মনে হতে লাগল মনসাগাছেরা মাথা ঘুরিয়ে আকন্দর ডাল থেকে রস গড়ানো দেখছে। লাঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। শুকনা কিচ্ছু বলল না। ওকে আমি মাঝে মাঝে রাতে জুজুর ভয় দেখাই। বাঁধের ওপর চড়ে খেজুর গাছের পাশে দাঁড়ালে, দিদিভাই বাড়ি থেকে দেখতে পারেন। তাই দাঁড়ালাম একটু ক্ষণ। তারপর ওদিক দিয়ে একটু নেমে থমকে দাঁড়ালাম।

একটা চ্যাপ্টা পাথরের ওপর ছেঁড়া পেন্টেলুম পরা একটা অদ্ভুত লোক বসে। একটা কুকুর-বাচ্চাকে আদর করছে। আমাকে দেখে বলল, 'কি মাস্টার, এর গায়ে একটু হাত বুলুবে নাকি ?'

ভারি ভালো কুকুরবাচ্চাটা। থ্যাবড়া কালো মুখ, পাটকিলে গা, ল্যাজটা কাটা। কাছে যেতেই লোকটা তাকে আমার হাতে তুলে দিল। শুকনা একটা উইঢিপির পেছনে লুকিয়ে পড়ল। আমি লোকটার পাশে পাথরের ওপর বসলাম। কুকুর-বাচ্চাটা আমার

কোলে হু-পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে, গাল মুখটুখ জিব দিয়ে চেটে একাকার।

লোকটা বলল, 'কিনবে নাকি?'

আমি বললাম, 'কি করে কিনব? আমার তো টাকাকড়ি নেই।'

'টাকাকড়ি নেই তো কি হয়েছে? ঐ তো হাতঘড়ি আছে।' হাতঘড়িটা জন্মদিনে পাওয়া টাকা দিয়ে কেনা। বললাম, 'ওটা দিয়ে কুকুর কেনা যায়?

সে বলল, 'তা ঠিক না গেলেও, তোমাকে ওটা সস্তায় ছেড়ে দিলাম।

এই বলে পকেট থেকে একটা সরু দড়ি বের করে, ওর গলায় বেঁধে, ওটাকে আবার আমার কোলে চাপিয়ে দিল, 'ওর নাম আমেরিগো ভেস্‌পুচি, কই, দেখি হাতঘড়িটা।'

বাঁধ থেকে নামার সময় উইঢিপির আড়াল থেকে বেরিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে শুকনা বলল, 'কাজটি ভালো হলনা, দাদা। শেষটা ঘড়ি নিয়ে যদি গোলমাল হয়?'

আমি চটে গেলাম, 'আমার নিজের টাকা দিয়ে কেনা ঘড়ি দিয়ে কুকুর-বাচ্চা কিনেছি। তাতে গোলমাল হবে কেন?'

শুকনা আস্তে আস্তে বলল, 'বড়বাবু বাড়িতে কুকুর ঢুকতে দেবে না।' মুখে বললাম, 'তার না হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে। আর বেশি কিছু বললে কলকাতা চলে যাব। মা কুকুর ভালোবাসে।'

শুকনা বলল, 'টিকিটের পয়সা কোথায় পাবে?' শুক্‌নাটা ভারি ইয়ে। ততক্ষণে প্রায় বাড়ি পৌঁছে গেছি। হঠাৎ দূরে একটা শিস্ শুনতে পেলাম আর অমনি কুকুর-ছানাটা মহা ছটফট করতে করতে আমার কোল থেকে ছিটকে নেমে পড়ে, এক নিমেষে হাওয়া!

আমরাও পেছন পেছন ছুটলাম। কিন্তু বন্দুকের গুলির মতো সে যে কোথায় মিলিয়ে গেল বুঝতেই পারলাম না। একেবারে বাঁধের ওধারের চ্যাপ্টা পাথর অবধি খুঁজে এলাম। বাড়ি ফেরার পথে শুকনাকে বললাম 'এ বিষয়ে দাদু কিছু জানতে পারলে তোর পেছনে

জুজু লেলিয়ে দেব।'

শুকনা বলল, 'ঐ লোকটা কুকুর চুরি করে ঐ রকম শেখায়। এতক্ষণে কুকুরটা ওর কাছে পৌঁছে গেছে।'

হাতঘড়ি নেই কেউ খেয়াল করল না। কিন্তু মনটা বড় খারাপ। দু তিন দিন পরে বিকেলের দিকে মালির ঘরের পেছনে গুদোম-ঘরের দরজার সামনে বসে গুলতি বানাচ্ছি, এমন সময় একটা হৈ-চৈ—'চোর! চোর! ধর! ধর!'

তারের বেড়া টপকে হাঁপাতে হাঁপাতে সেই লোকটা একেবারে আমার পায়ে পড়ল, 'ও দাদা! আমাকে না বাঁচালে পাঁচটা কুকুর-ছানা না খেয়ে মারা যাবে।'

কি আর করি, দিলাম তাকে গুদোম ঘরে ঢুকিয়ে। দরজাটা ভেজিয়ে আবার সিঁড়ির ওপর বসে গুল্‌তি বানাতে লাগলাম। কেউ ওকে খুঁজে পেল না। দাদুরা একবার এদিক দিয়ে ঘুরে গেল। কিছু টের পেল না। সবাই চলে গেলে ওকে বললাম, 'এবার অন্ধকার হয়ে এসেছে, তুমি শালবনের মধ্যে দিয়ে চলে যাও, কেউ টের পাবে না।'

সে বেরিয়ে এসে বলল, 'কি বলে তোমাকে ধন্যবাদ দেব?'

আমি বললাম, 'আমেরিগোকে তুমি চুরি করে এনে আমার কাছে বেচে দিয়েছিলে। তোমার শিস্‌ শুনে আবার তোমার কাছে ফিরে গেছে। দাও আমার হাতঘড়ি ফিরিয়ে।'

সে বলল, 'তা কি করে দেব? সেটা বেচে কুকুর-ছানাদের খাবার কিনেছি যে।'

'তাহলে আমেরিগোকেই ফিরিয়ে দাও।'

'ও মা, কি বলে! আমেরিগোর আসল মালিক তাকে চিনতে পারল বলেই তো আজকের এই হাঙ্গামা! তাকে কোথায় পাব? তুমি বরং তার বদলে এই চি-হুয়া-হুয়াটাকে নাও।'

এই বলে পকেট থেকে পাঁচ ইঞ্চি লম্বা গোঁপওয়ালা একটা মিষ্টি ছানা আমার হাতে গুঁজে দিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

ছানাটাকে আমার শোবার ঘরে গিয়ে সবে পকেট থেকে বের করে ভাবছি কি নাম রাখব, এমন সময় দিদিভাই এসে বললেন, 'ও মা। কি মিষ্টি ভামের বাচ্চা। কোথায় পেলি?'

আমি বললাম, একজন দিয়েছে। ওর নাম চি-হুয়া।'

এরা ভামের বাচ্চা পুষতে দেবে, কিন্তু কুকুর-বাচ্চা দেবে না।

চি-হুয়া আজকাল বেশ বড় হয়েছে। কলকাতায় আমাদের উঠোনের পাশে আমগাছে চড়ে পাখির ডিম খায়। তা হতে পারে ভামের বাচ্চা, তাতে কি হয়েছে?

—*—



কোকোর কথা

এটা একটা কুকুরের গল্প। কুকুরটার নাম কোকো। এ হল কোকোর জীবনের এক দিনের ঘটনা। সেদিন ভোর থেকেই কোকো টের পাচ্ছিল যে দিনটা বেজায় ভালো। চার দিক থেকে কেমন একটা শুকনো পাতার, মরা শ্যাওলার, পাকা ফলের গন্ধ নাকে আসছিল। ইঁদুরের গর্তের কথা, খরগোশের বাসার কথা, পাখির ডানার কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। শীত পড়ে এলে, শুকনো শুকনো গরম জিনিসের কথা ভাবতে কি ভালোই যে লাগে! পাখিদের গা কি যে নরম আর গরম সে ভাবা যায় না!

বাড়ির পিছনে একটা মাটির ঢিপি, টিলাও বলা চলে। তার পিছনে খোলা মাঠ ; তার ঘাসগুলো রোদে শুকিয়ে আছে ; মিষ্টি গন্ধ বেরুচ্ছে। ঐ ঘাসের ওপর দিয়ে ক্যায়সা দৌড়নো যায়। তারপর চার ঠ্যাং শূন্যে তুলে কি চমৎকার গড়াগড়ি!

মাঠের পরই শালবন। সেখানে শুকনো ফুলের আর কাঠবেড়ালির গন্ধ। এসব কথা ভেবেও কোকোর প্রাণটা আনচান করে উঠল। নাক তুলে সে ভোরের গন্ধ শুঁকল। বাড়ির সামনে পুরনো গোলাপ বাগান। সেখান থেকে কি ভালো রোদের গন্ধ ওঠে। লোমওয়ালা লাল শুঁয়োপোকার কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল! তবে ওদের

বেশি কাছে নাক নিতে নেই।

বাড়ির পিছনে তার টানানো। তাতে কাপড়চোপড় রোদে শুকোনো হয়। তারো কি ভালো গন্ধ! ইচ্ছে করে খেয়ে ফেলি! খুব ছোট বেলায়, একবার কোকো সত্যি করে একটু খেয়ে দেখেছিল। উঃফ্! সে কথা মনে করলে এখনো হাত-পা পেটে সেঁদোয়!

অথচ এমন কিছুই বেশি খায়নি কোকো। তারে ঝোলানো বুটন-টুটনের মায়ের একটা রোদে শুকোনো শাড়ির এক দিকের দু-তিন জায়গায় শুধু একটু চিবিয়েছিল। খুব ছোট্ট ছোট্ট তিন চারটে ফুটো হয়ে গিয়েছিল। সে এমন কিছু নয়। তাকে খাওয়া বলা যায় না। কিন্তু তাই নিয়ে বুটন টুটনের মা এমনি চ্যাঁচামেচি লাগালেন যেন গোটা শাড়িটাকেই খেয়ে ফেলেছে! গোটা শাড়ি খাবে কি! অতি বদ খেতে, এতটুকু রস বা হাড্ডি নেই!

বুটন-টুটনের বাবাও তেমনি। পা থেকে এই বড় নাক তোলা চটি খুলে কোকোকে সটাসট্ পটাপট্ সে কি পেটনাই! কোকোও তখন বিকট জোরে কেঁউ-কেঁউ-কেঁউ করে বেদম চিল্লিয়েছিল। এমন কি পাশের বাড়ি থেকে ঝিল্লিদের বাবা পাঁচিলের কাছে এসে বলেছিলেন, 'চটিপেটা করে শুধু ছাল ছাড়িয়ে নিচ্ছিস্ কেন? একেবারে মেরে ফেল না।' তখন বুটন-টুটনের বাবা থামল। তাছাড়া চটির তলার দিকটা খুলেও এসেছিল। তাও হয়তো থামত না, কিন্তু বুটন-টুটন এমনি কান্না জুড়ে দিল যে শেষ পর্যন্ত কি সব বিড়বিড় করে বলতে বলতে, ছেঁড়া চটি পায়ে দিয়ে বাবা ঘরে চলে গেল।

এসব অনেক দিন আগের কথা। এখন সবই অন্য রকম। সে টুটন-বুটন আর নেই। তারা এখন বড় হয়ে গেছে। বই নিয়ে স্কুলে যায়। বিকেলে বন্ধুদের সঙ্গে বল্ নিয়ে খেলে। কোকোর সঙ্গে খেলা করার তাদের সময় কোথায়? তাছাড়া তিন মাস আগে ওদের মামা একটা সাদা বিলিতি কুকুরের বাচ্চা এনেছে। দিন-রাত তাকেই খাওয়াচ্ছে পরাচ্ছে। আবার নাম রাখা হয়েছে জুলি! তার

জন্য সোনালী ঘুন্টি দেওয়া লাল কলার এনেছিল, সেটা অবিশ্যি এখন আর নেই। দিয়েছে কোকো দাঁত দিয়ে নতুন কলার তছনছ করে। কত আর সহ্য হয়?

তাই টুটুন-বুটুন কোকোকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে এই পুরনো আস্তাবলে বেঁধে রেখে দিয়েছে। আস্তাবল বলতে অবিশ্যি এখন আর এটা কিছু সত্যিকার আস্তাবল নয়। আগে ছিল চার পাঁচটা ঘোড়া। কাঠের দেয়াল তুলে উঠোনটাকে দুভাগ করা। আগে অন্য দিকে গোয়াল ছিল। টুটুনের ঠাকুরদা বুড়ো কর্তা যখন ছিল, তখনো ওখানে চারটে দুধেলা মুলতানি গাই ছিল। তাদের শিংগুলো পিতল দিয়ে বাঁধানো ছিল।

অনেক কুকুর থাকত তখন আস্তাবলে। তারা দুবেলা জামবাটি ভরতি দুধ দিয়ে ডগ্-বিস্কুট খেত। এই বড় বড় বিলিতী বিস্কুট। দুধে ডুবে থেকেও দাঁতের মাঝে কুড়মুড় করত। কোকোর মা-ও এখানে থাকে। আস্তাবলের চার দিকে তাকিয়ে কোকো ভালো করে দেখে নিল। এখানে থাকতে তার কিছু, খারাপ লাগে না। বরং ভালোই লাগে। তখন সাতটা কুকুর থাকত। ভালো করে শুঁকলে, এখনো তাদের গায়ের গন্ধ পাওয়া যায়। মায়ের গন্ধ পায় কোকো। ছাদের আংটা থেকে ঐ যে চামড়ার টুকরো ঝুলছে, ওটা হল মকুর জিনের টুকরো। মকু ছিল আস্তাবলের সবচেয়ে ভালো ঘোড়া। কোকো মকুর গন্ধও পায়।

মকুর পিঠে ঐ জিন চাপিয়ে, তার উপর চড়ে, বন্দুক হাতে, বড়-কর্তা ঐ বনে শিকার করতে যেত। অমনি সব কটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করতে করতে সঙ্গে সঙ্গে ছুটত। কিন্তু বনে ঢুকেই সব চুপ। নয়তো পাখি, জানোয়ার সবাই পালাবে।

এসব মা-র কাছে শোনা। কোকো কখনো বড়-কর্তার সঙ্গে বনে যায়নি। কোকো নাকি তখন ছিলই না। শুনে হাসি পেল। সে যে কবে ছিল না, কই, সে-কথা তো তার একটুও মনে পড়ে না।

যতদূর মনে পড়ে, বড় কর্তা বারান্দায় আরাম কেদারায় শুয়ে রোদ পোয়ায়, কোথাও যায় না। নাকি মকুর পিঠ থেকে পড়ে, পিঠ জখম করে ঐ-দশা হয়েছিল।

পরে বড় কর্তাকে খাটে শুয়ে ফুল দিয়ে গা ঢেকে কোথায় যেন চলে যেতেও দেখেছিল কোকো আর সে ফেরেনি। তারপর অনেক দিন কেটে গেছে। সেদিন টুটুন-বুটুন বলছিল কোকো নাকি বুড়ো হয়ে গেছে, তাই একটা বাচ্চা কুকুর আনা দরকার। তাই তো মামা সাদা কুকুর-বাচ্চা এনে দিল। বুড়ো হবার কথা শুনে কোকো খুব অবাক হয়েছিল। কারণ মা তো সর্বদা বলত কোকো নাকি বাচ্চা কুকুর।

আস্তাবলের বাইরে একটা লোক অনেকক্ষণ ধরে বসে বসে কোকোকে দেখছিল। ও বাসনপত্র সারায়, ওকে ঝালাইওয়ালা বলে। তারপর বীরু গয়লা এসে ডাক দিতেই, বুড়ো রাধু, রান্নাঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এসে, বড় গামলায় দুধ মেপে নিল। রাধুকে দেখে কোকো ল্যাজ নাড়তে লাগল। রাধু বলল, 'আবার ল্যাজ নাড়া হচ্ছে! লজ্জাও নেই! আজ তোর দুধ-রুটি বন্ধ—হুকুম হয়েছে। তোর আমার দিন গেছেরে, কোকো।'

কোকো তো অবাক। দিন গেছে আবার কি! ঐ তো সামনে সমস্ত লম্বা রোদে ভরা দিনটা পড়ে রয়েছে। গলার দড়ি ছিঁড়ে একবার বেরিয়ে পড়লেই হল। কি সব ভালো ভালো গন্ধে ভরা মাঠ, বন সামনে পড়ে আছে। গয়লা ততক্ষণে চলে গেছে, রাধু দুধ নিয়ে চলে গেছে, ফটক রয়েছে খোলা।

পিছন থেকে ঝালাইওয়ালা দু আঙুল দিয়ে একটুখানি তুড়ি দিল। আর অমনি বাইরের সব ভালো ভালো গন্ধগুলো একসঙ্গে হুড়মুড় করে কোকোর নাকে এসে ঢুকল। এক ঝাঁকি দিয়ে দড়ি ছিঁড়ে কোকো হাওয়া। ঝালাইওয়ালা ছাড়া কেউ সেটা লক্ষ্য করল না।

কোকো আর অপেক্ষা করল না। বাতাসের বেগে টিলা পেরিয়ে খোলা মাঠের শিশির-ভেজা ঘাসে ত্বার গড়িয়ে, একেবারে বনের ধারে। ঝালাইওয়ালা অনেক ডাকল ; ঝুলি থেকে কিসের শুকনো শিকড় বের করে অনেক নাড়ল। শিকড়টার ভালো গন্ধ। কিন্তু একটু কাছে যেতেই, ঝালাইওয়ালার হাতে দড়ি দেখে কোকো একেবারে পগার পার!

বনের মধ্যিখানে না পৌঁছে আর থামা নয়। থামতেই একটা চেনা গন্ধ নাকে এল। এ গন্ধ কোকো আগেও পেয়েছে, হয়তো নিজের নাক দিয়ে শোঁকেনি, মা শুঁকেছিল। কিন্তু গন্ধটা যে খুব চেনা তাতে সন্দেহ নেই।

বনের মাঝখানে খানিকটা জায়গা জুড়ে জল। আর সেই জল-কাদার উপর লাখে লাখে পাখি। এরা কোন দূর দেশ থেকে উড়ে এসে, এইখানে শীত কাটায়। শীতের শেষে আবার নিজেদের দেশে উড়ে যায়। এই পাখি আকাশে উড়লে গুড়ুম করে বন্দুক দিয়ে মারত বুড়ো কর্তা। ঝুপ করে সেই পাখি জল-কাদায়, ঝোপে-ঝাড়ে পড়ত। অমনি মা, কোকো, মলি, ভুটো, জন, জেনি আর রিকি—এরা দৌড়ে গিয়ে তাদের তুলে আনত। আস্তে করে, শুধু ঠোঁট দিয়ে পাখি তুলতে হয়। তাদের গায়ে দাঁত লাগাতে নেই। এ সব মা-র কাছে শেখা। কোথায় যে গেল মা, অনেক দিন কোকো তাকে দেখেনি।

গাছের গর্ত থেকে বেরিয়ে একটা ছোট জানোয়ার খর খর করে নিচে নেমে এসে, মোটা ল্যাজ তুলে, মহা বকাবকি করতে লাগল। কোকো একটু ফোঁশ্ শব্দ করতেই, আবার খর খর করে গাছে উঠে পড়ল। বিচির আর বাকামের গন্ধ নাকে এল। ওকে বলে কাঠবেড়ালি।

কোকো দেখল গাছের গোড়াটি কি সুন্দর নরম শুকনো শ্যাওলায় ঢাকা' রোদে গরম। সেইখানে গিয়ে যেই না শোয়া, অমনি ঘুম।

গাছের উঁচু উঁচু শিকড় ওকে জড়িয়ে ধরে রইল। ছোটবেলায় টুটুন-বুটুন যেমন করে ওকে নিজেদের বিছানায় নিয়ে জড়িয়ে ধরে রাখত, ঠিক তেমনি।

সারা দিন কি ঘুম, কি ঘুম। বিকেলে যখন ঘুম ভাঙল, সে কি সাংঘাতিক খিদে। সারাদিন খায়নি। একটা ছোট চারপেয়ে জন্তু যাচ্ছিল। সেটাকে হয়তো খাওয়া যেত, কিন্তু বড় বিশ্রী গন্ধ। তা ছাড়া খায়ই বা কি করে? চটা-ওঠা কলাই-করা বাটিটা কোথায়? কোকো তো তাতেই খায়।

এক পেট ডোবার জল খেল কোকো। লম্বা ল্যাজওয়ালা কুমীরের মতো দেখতে একটা জন্তুকে কিছুক্ষণ তাড়া করল। সেটা গিয়ে কাঁটা ঝোপে সেঁদোল। কোকোও নাক বাড়িয়ে শুঁকতে যাচ্ছিল, হঠাৎ কানের কাছে শ্-শ্-শ্-শ্!! কেকোর গায়ের রক্ত হিম। দেখে দুটো বরফের মতো ঠাণ্ডা চোখ ওর দিকে চেয়ে আছে। একটা চেরা জিব বেরিয়ে আছে। মাটি থেকে এক হাত উঁচু করে তোলা, একটা চ্যাপ্টা মাথা একটু একটু দুলছে। কোকোর পাগুলো আড়ষ্ট হয়ে এল। নড়াচড়ার ক্ষমতা রইল না।

হঠাৎ অনেক দূরে কান্নার মতো কাদের গলার শব্দ শোনা গেল। 'কোকো—ও—ও! কো—কো—কো—ও—ও! কোকোরে—এ—এ—এ!'

টুটুন-বুটুনের গলা! ও কি, ওরা কাঁদছে নাকি? ওরা না বড় হয়ে গেছে? কোকোর দুকান খাড়া। হঠাৎ মনে পড়ল মা বলেছিল যারা বুকে হাঁটে, তাদের কাছ থেকে পালাতে হলে, পাশের দিকে লাফ দিতে হয়।

অমনি পাশের দিকে এক লাফ দিয়ে শাঁ করে কোকো ছুটল। 'খেউ, খেউ, খেউ! এই যে আমি আসছি! আর ভয় নেই, টুটুন-বুটুন! খেউ, খেউ, খেউ!

সে রাতে দুধ-রুটি খেয়ে কোকো আবার টুটুন-বুটুনের খাটে শুল।



ভালোবাসা

আজকাল সবই অন্যরকম লাগে। দরজার কড়া নাড়বামাত্র ভিতর থেকে একটা ভারী জিনিস দরজার উপর আর আছড়েও পড়ে না ; নখ দিয়ে কেউ দরজায় আঁচড়িয়ে, পালিশ উঠিয়ে, বকুনিও খায় না ; ঘরে ঢুকবামাত্র নেচেকুঁদে গায়ের উপর চড়ে একাকারও করে না। মিনু শংকর কেউ কারো দিকে তাকায় না।

শোবার ঘরের মেজেটা অদ্ভুতরকম খালি-খালি লাগে ; অদ্ভুত চুপচাপও, খচ্‌মচ্‌ করে কেউ চলে বেড়ায় না, থপ্‌থপ করে কানের উপর ল্যাজ আছড়ায় না।

শুধু পিসিমা একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, "আঃ, আপদটা বিদায় হয়ে ঘরদোরগুলো যেন কেমন হালকা হয়ে গেল। এবার একটু নিশ্চিন্দি হয়ে হাত-পা মেলে বসা যাবে। সদাই ভয়ে-ভয়ে থাকতাম ঐ বুঝি ক'ন্‌ থেকে কিসে মুখ দিয়ে আমায় এসে চাটল। আর তোদেরও বাবু বলিহারি! ঠাকুরদা ত্রিসন্দে জপতপ না সেরে জলস্পর্শ করত না, আর তোদের কিনা ঐ কুত্তোটার সঙ্গে একপাতে না খেলেই নয়। অস্বীকার করিস নে, স্বচক্ষে দেখেছি টেবিল থেকে সব চুপি চুপি প্লেট নামানো হচ্ছে!"

মিষ্টু শংকর কেউ অস্বীকার করল না; কোনো কথাই বলল না নিঃশব্দে যে যার বই বের করে নিয়ে পড়তে বসে গেল। সাবধানে ঘুরে বসল যাতে আলমারির ঐ কোণটাতে যেখানে পুরানো সবুজ কম্বল-খানি পাতা থাকত সেদিকে চোখ না পড়ে!

পিসিমার কথা শুনে বাবা দোরগড়ায় একবার দাঁড়িয়েছিলেন, এবার তিনিও নিঃশব্দে পাশের ঘরে চলে গেলেন। শুধু মা একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "হ্যাঁ, আর তার জন্য কোনো হাঙ্গামা নেই।"

পিসিমা একটু অবাক হয়ে মার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, "হাঙ্গামাও নেই, বউ, খরচাও নেই। ওর পেছনে তোমরা এক-বছরে যা খরচ করেছ, তাতে এক-আধটা গরিব ছেলের স্বচ্ছন্দে খাওয়া-পরা চলে যেত। সেজদিদিরাও বলছিল, তোমাদের সব-তাতেই বাড়াবাড়ি। কুকুরের জন্য রোজ রোজ দুধ রে পাঁউরুটি রে, মাংস রে—এ-সমস্ত বাড়াবাড়ি।"

মিষ্টু শংকর আস্তে আস্তে বই হাতে করে উঠে গেল। মা বললেন, "তা হলে জন্তু-জানোয়ার না পোষাই উচিত, ঠাকুরঝি!"

"হ্যাঁ, পুষতে হয়, গোরু মোষ পোষ, দুধটা পাবি! নিদেন একটা ছাগলই পোষ, তার দুধেরও ভারি গুণ, মহাত্মাজি খেতেন। নয়তো বেড়াল পোষ, ইঁদুর মারবে। তা নয় এ কোথাকার লাটরে বাবা, ইঁদুর-বাঁদরের দিকে ফিরেও তাকায় না, খালি ঐ মিষ্টু শংকরের পিছন পিছন ঘুর্-ঘুর্ করবে!"

মা বললেন, "ওরা বাড়ি পৌঁছবার অনেক আগে থাকতেই কেমন কার জানি টের পেত। অমনি উঠে দোরগোড়ায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত।" পিসিমা বিরক্ত হয়ে উঠে পড়লেন, "যাই বাবা, আমারও তো পুজোআচ্ছা আছে!"

সবার পাতে মোটা-মোটা হাড়গুলো সব পড়ে থাকে, ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া হয়! সবাই লক্ষ্য করে, কেউ কোনো কথা বলে না। সন্ধেবেলা বাবা একবার বলে বসলেন, "আর কুকুর পুষব না। বাঁচেও না বেশিদিন, শুধু হাঙ্গামা বাধায় আর মায়ায় জড়ায়।"

মা বললেন, "আমিও সেই অবধি মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করে বসে আছি, আর কখনো নয়।" এতক্ষণ পরে মিন্থু শংকরের কথা ফুটল; তুজনে জোর গলায় বলে উঠল, "সত্যি মা, আর কখনো নয়!" শংকর আরো বলল, "জানো, রাত্রে আমার ঘুম ভেঙে যায়, কিরকম নিঃশ্বাস ফেলা শুনতে পাই, ভুলে যাই, উঠে পড়ে দেখতে যাই ও ঘুমুচ্ছে কি না।"

পিসিমা ঘরে এসে শেষ কটি কথা শুনে বললেন, "হয়েছে! বলি, তোদের পিসেমশাই স্বর্গে গেলেন, কই তাঁর নিঃশ্বাস তো একদিনও শুনলাম না, আর তোরা তোদের কুকুরের শোকেই যে হেদিয়ে গেলি। এবার আবার একটিকে এনে তুঃখ ভোলা হবে নাকি?" বাকি চারজনে সমস্বরে বলে উঠল, "না, না, আর কখনো নয়।"

"যাক' তবু যে সুবুদ্ধি হল সেই রক্ষে। পই-পই করে বলি নি ও-সব জন্তু-জানোয়ার ঘরে এনে ঢোকাস নি রে বাবা! যত সব রোগের ডিপো। এই কোলে এসে মাথা রাখছে, এই গায়ের উপর থাবা রাখছে, উঃ, দেখে দেখে আমার গা ঘিন্-ঘিন্ করে উঠত। তা বাপু কিছু বলবার কি জো ছিল?"

মিন্থু শংকর একটু অস্বাভাবিক রকম জোরে বলল, "যাক, এখন তো আর সে নেই, এখন খুশি হয়েছ তো?"

এমনি করে দিন কাটে। পিসিমা ঝিকে জিজ্ঞাসা করেন, "হ্যাঁলা, ওটার বাসনকোসনগুলো ফেলে দিয়েছিস তো? নইলে আবার অন্য বাসনের সঙ্গে তুলে রাখলে মিলে-মিশে একাকার হয়ে যাবে। কোনোই তফাত তো নেই। যত সব আদিখ্যেতা এদের।" ঝিও একগাল হেসে বলল, "কে জানে, পিসিমা, দিয়েছে হয়তো ফেলে। উঃ কি বলব পিসিমা, হিঁতুর মেয়ে আমি, আমাকে পর্যন্ত ঐ কুত্তোর সেবায় লাগিয়ে দিয়েছিল! হ্যাঁ সায়েবরাও কুকুর পোষে বটে, কিন্তু তার কাজ করে জমাদার! আর হেথা ঘাটেও আমি, গঙ্গাতেও আমি। তা মা দিয়েছেনও এটা-সেটা আমাকে, মিথ্যে বলব নি। আর আমিও

বাসনটা মেজে দিয়েছি, কম্বলটা কেচে দিয়েছি। ও-সব আর এখন করতে হচ্ছে না, বেঁচিছি।"

এক মাস বাদে ঐ ঝিই একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "কি জানেন পিসিমা, মনটা কেমন ফাঁকা-ফাঁকা লাগে। ঐ যে ছাদের কোণে লাটি-গাছটি দেখছেন ঐটে টেনে টেনে নিয়ে বেড়াত আর সক্কালবেলায় উঠোনের দুয়োর খুলে ভিতরে যেই-না ঢুকেছি, সে কি ল্যাজ নাড়ার ধুম! সত্যি বলছি মা, আমায় দেখে আর কেউ অমনটি খুশি হয় নি কোনো জন্মে, অথচ কিচ্ছু তো পেত না আমার কাছটিতে। হ্যাঁ, পিসিমা মারা কি আর-একটা আনবে-টানবে না?"

পিসিমা এমন একটি চেলা হারিয়ে বিরক্ত হয়ে বললেন, "না-রে বাবা, আর দরকার নেই। ওরা চারজনেই প্রতিজ্ঞা করেছে আর কক্ষনো নয়।" ঝি আর-একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'কি জানি, ডাক্তারবাবু একদিন বলেছিলেন, "যাঁরা কুকুর নিয়ে একবার বাস করেছেন, তাঁরা কুকুর ছাড়া আর থাকতে পারেন না। বড় আদুরে ছিল, পিসিমা, আমাকে দেখলেই এত খুশি হত, ধপাধপ শব্দ করে ল্যাজটা নাড়ত।

পিসিমা রবিবার সকালে কথাটা একবার নিজেই পেড়ে, সবাইকে যাচিয়ে নিলেন।

হ্যাঁরে নতুন খবর শুনছিস? ঐ পাতির-মা কুকুরের সঙ্গে এ্যাদ্দিন শুম্ভ-নিশুম্ভের লড়াই চালিয়ে এসেছে, এখন ওর নাকি ভারি মন কেমন করে। তা আমিও বলে দিয়েছি, বাপু, সে মনই কেমন করুক কি যাই করুক আর নয়।"

কেউ কোনো কথা বললে না। আরো কদিন কাটল। একদিন ডাক্তারবাবু এসে বলবেন, "কি, কুকুরের শোক কমল? ভালো ভালো কুকুরের ছানা বিক্রি হচ্ছে যে।" মার জন্মদিন আজ, সবাই বড় ব্যস্ত। মা সমানে কিসমিস বেছে যেতে লাগলেন, অম্বলে পায়েসে ঘিভাতে লাগবে। শংকর মিনু পরস্পরের দিকে তাকাল আর বাবা একবার

খবরের কাগজটা নামিয়ে সকলের মুখ ভালো করে দেখে নিয়ে, আবার খবরের কাগজের মধ্যে ডুবে গেলেন। শেষে মা বললেন, "আবার কুকুর।"

সন্ধ্যের মধ্যে রাঁধাবাড়া সেরে, ছেলেমেয়ে ও তাদের বাবার হুকুম মতো মা স্নান করে, নতুন কাপড়খানি পরে বসেছেন। পিসিমা খুশি হয়ে বললেন, "বাঃ এই বেশ হয়েছে, বউ! আচ্ছা এদের কাউকে দেখছি না যে, সব গেল কোথায় ?"

"কি জানি, সব একে একে তো বেরুল। ঐ যে ঠাকুরঝি, এক-আধজন এল বোধ হয়।"

প্রথমে এল মিনু আর শংকর কাপড়ে কার কি ঢাকা দিয়ে। মার কোলে ফেলে দিয়ে বলল, "এই নাও মা, তোমার জন্মদিনের উপহার।"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাবাও এলেন, "এই নাও গো একটা জিনিস আনলাম তোমার জন্যে, ধরো। "বলে আরেকটা কাপড়ে ঢাকা কি কোলে ফেলে দিলেন।

পিসিমা অবাক হয়ে দেখলেন, মার কোলে দু-দুটো মিশকালো কুকুর-বাচ্চা এ ওকে ঠেলাঠেলি করছে, মাড়িয়ে দিচ্ছে, ক্ষুদে-ক্ষুদে ল্যাজ নাড়ছে। লাল লাল জিব ঝুলছে।

সবাই হেসে ফেলল, "এঁ্যা, বাবা। তুমিই বুঝি অন্যটি কিনেছিলে ? ঐ মেম বলল, একজন খুব মোটা ভদ্রলোক কিনে নিয়ে গেছেন।"

বাবা বললেন, "আমিই তো। এই, তোরা অত পয়সা পেলি কোথায় রে ?"

"বা—বা! আমাদের বুঝি জন্মদিনের জমানো টাকা ছিল না ? আর বাকিটুকু তো পিসিমাই দিলেন।"

পিসিমা হঠাৎ উঠে পড়ে বললেন, "যাই, চট্ করে সন্ধ্যেটা সেরে আসি! বা—ব্বাঃ এদ্দিন তো বাড়ি ছিল না, হয়েছিল একটা গোরস্থান! ঐ ছাখ, পাতির-মার সব-তাতেই বাড়াবাড়ি, দু-দুটো বাটি কোত্থেকে আনল বল দিকিনি। ওরে, আমার দুধ থেকেই নিস আজ, কাল থেকে আনালেই হবে।"



তাকে উল্টে দেখলাম থাবার তলাটা গোলাপী মখমলের মতো, মাঝে মাঝে কচি-কচি সাদা লোম। পেটের তলাটাও গোলাপী—নরম তুল্‌তুলে এক জায়গায় একটা শিরা না কি যেন ধুক্‌ধুক্‌ করছে। মুণ্ডুটাকে তুলে আবার নিজের পেট দেখতে চেষ্টা করছে, চোখ দুটো বিল্‌ বিল্‌ করছে। মুখের কাছে তুলে ধরতেই কচি একটা লাল জিব বের করে আমার গাল-গলা চেটে দিতে লাগল। আঃ!

একটু দুধ পেলে বেশ হত। খুকুর বাটিটা হাতে নিয়ে গুটিগুটি গেলাম রান্নাঘরের দরজার কাছে।

"ও পিসিমা, একটু দুধ দেবে?" পিসিমা হাসি-হাসি মুখ করে হাতা ভরে দুধ নিয়ে দরজার কাছে এলেন।

"খিদে পেয়েছে বুঝি, দেখি বাটি!"

বাটি এগিয়ে দিলাম।

পিসিমা হাতা হাতে অবাক হয়ে আমার বগলের দিকে চেয়ে রইলেন।

"ছি, ছি, ওটাকে ফেলে দে বলছি! ভারি নোংরা জানোয়ার, ঘরদোর একাকার করবে এখুনি!"

বাচ্চাটাকে তুলে ধরলাম, "ছাখ, পিসিমা, কিরকম গুল্‌গুল্ করে তাকাচ্ছে। দাড়ির নীচের খাঁজগুলো ছাখ!"

পিসিমা দুধের হাতা মাটিতে ফেলে দিয়ে দু হাত সরে গেলেন—"আহা, কি করিস, কি করিস, রান্না করছি যে! ভালো চাস তো যেখান থেকে এনেছিস সেখানে দিয়ে আয়!"

বাচ্চাটাকে নীচে নামিয়ে দিলাম। লাল একটা ক্ষুদে জিব দিয়ে চুক্‌চুক্ করে মাটি থেকে দুধ চেটে খেতে লাগল। পিসিমা কি দেখতে পাচ্ছেন না?

পিসিমা বললেন—"তোমার বাবা একবার দেখলে হয়! এমনি-তেই বিষম রেগে আছে, তোমার দাদা-রত্নটি অঙ্কে বারো পেয়েছে। তাই নিয়ে অনেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা হয়ে গেছে। এখন ছুটির দিনে, চাঁদ, তুমি এলে নেড়িকুত্তোর বাচ্চা কোলে করে। তাও যদি মোটাসোটা সাদা রঙের হত! তোমার কপালে আজ কি আছে কে জানে! তোমার রিপোর্ট এসেছে? যাও-না উপরে, কি হয় দেখো!"

বিষম রাগ হল বাচ্চাটাকে তুলে নিতে চেষ্টা করলাম।

"পিসিমা ভালো না, খাস না ও দুধ। আমি তোকে ভালো দুধ কিনে দেব।"

কিন্তু বাচ্চাটা কিছুতেই ছাড়বে না, ভীষণ ভাবে দুধ চেটে সাফ করে দিতে লাগল।

"ওঃ, নবাব! মাস-কাবারে পাস তো একটা টাকা! তাও তো খেয়ে-দেয়ে দেনায় ডুবে থাকিস! উনি আবার দুধ কিনবেন!"

জোর করে বাচ্চাটাকে তুলে নিলাম।

"আচ্ছা আচ্ছা, দেখা যাবে, দুধ কিনতে পারি কিনা দেখা যাবে! আর, কি রিপোর্টের ভয় ছাখাচ্ছ? আমার রিপোর্ট কোথায় হারিয়ে গেছে।"

পিসিমা আঁৎকে উঠলেন—"রিপোর্ট হারিয়ে গেছে কিরে? ওরে শোন্‌-না, আবার কোথায় চললি—"

আমি উঠোন পার হয়ে, চৌবাচ্চার পাশের খিড়কি দরজা দিয়ে বেরিয়ে, আস্তে আস্তে পিছনের বাগানে গেলাম।

পেয়ারাগাছ তলায় দাদা চুপ করে শুয়ে আছে। নিচু ডালে দুটো ইয়া বড়া-বড়া পাকা পেয়ারা ঝুলছে, দাদা সেগুলো পাড়ছে না।

আমি কুকুর-বাচ্চা কোলে নিয়ে সে দুটো পেড়ে দাদার পাশে আসন-পিঁড়ি হয়ে বসলাম। কুকুর-বাচ্চাটাকে আমার সামনে বসালাম। সে দুটো ছোট-ছোট থাবা গেড়ে উঁচু হয়ে বসে, ঘাড় কাত করে অবাক হয়ে দাদাকে দেখতে লাগল।

দাদা মুখ তুলে রেগে-মেগে বলল, "যা এখান থেকে। চান কর গে, ভাত খা গে।"

আমি বললাম, "তুমি করবে না?"

"না, যা বলছি এখান থেকে, নইলে ভালো হবে না!"

কুকুর বাচ্চাটা আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে দাদার কান চাটতে লাগল। দাদা চমকে, হাত-পা ছুঁড়ে, একেবারে উঠে বসল। ইস্, মুখটা কি লাল টকটকে! দাদা হাঁ করে কুকুর-বাচ্চাকে দেখতে লাগল। সে দাদার হাঁটুর উপর ক্ষুদে মাথাটা রেখে সরু দড়ির মতো ল্যাজটা নাড়তে লাগল। দাদা শেষটা ওর মাথায় হাত বুলোল, ওকে কোলে তুলে নিল, ওর পেটে মুখ গুঁজে দিল।

তার পর ওকে কোলের উপর নামিয়ে রেখে বলল, "দে তো একটা পেয়ারা। ইস্, কি বড়-বড় হয়েছে এই কদিনে।" দুজনে পেয়ারা দুটো খেয়ে ফেললাম, বিচি-টিচি সব গিলে ফেললাম।

দাদা বলল, "পেয়ারা গাছের ছায়াটা পাঁচিলের কাছে চলে গেছে। কত বেলা হয়ে গেছে! তুই যা, চান কর।"

আমি মাথা নাড়লাম।

দাদা বলল, "খাবি না?"

"না, আমার পেটব্যথা হয়েছে।"

"বাচ্চাটা খাবে না?"

"পিসিমার কাছ থেকে দুধ নিয়ে খাইয়েছি। পিসিমা হয়তো বাবাকে বলে দেবে, তা হলে হয়েতো বাবা ওকে রাখতে দেবে না।"

দাদা ঘাসের উপর চিত হয়ে শুয়ে বাচ্চাটাকে বুকের উপর বসিয়ে রেখেছিল।

"তবে কি হবে?"

"হয়তো বলবে না। দাদা, মা থাকলে বেশ হত, কেন যে মা আবার মামাবাড়ি গেল! কি বাজে জায়গা, কেন যে যায়!"

দাদা চোখ বুজে কুকুরটাকে বুকে চড়িয়ে চুপ করে শুয়ে রইল।

"কি নাম রাখা যায় বল তো?"

দাদা চোখ খুলে বলল, "টাইগার" বেশ নাম।

আমি বাচ্চাটাকে শূন্যে উঁচু করে ধরে বললাম—

"এই টাইগার! বুক তুলে মাথা উঁচু করে দাঁড়া! টাইগার হয়েছিস, ব্যাঘ্র হয়েছিস।"

টাইগার শূন্যের উপর ল্যাজ নাড়তে চেষ্টা করতে লাগল। পিসিমা উঠোন থেকে আমাকে ডাকতে ডাকতে খিড়কি দরজা অবধি এলেন। দাদা বলল—

"যা শিগ্‌গির!" বলেই কাঁটা-ঝোপটার পেছনে লুকিয়ে পড়ল।

আমি আস্তে আস্তে পা টানতে টানতে পিসিমার কাছে গেলাম।

"আচ্ছা ছেলে বাপু তুমি! বারোটা বাজল, স্নান নেই, খাওয়া নেই। তোমার মা এলে আমি বাঁচি।"

আমি বললাম, "মা এলে আমিও বাঁচি! আমার অসুখ করেছে, আমি স্নানও করব না, খাবও না।" বলে আমি খুব খানিকটা কেঁদে-টেঁদে পিসিমাকে ব্যস্ত করে তুললাম।

শেষটা গরম জল দিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে মুছে কাপড় ছেড়ে শুতে গেলাম। দাদা যে কোথায় গেল?

পিসিমা বললেন, "যাই বাবা, খাওয়ার পালা সেরে আসি। বেশ ছুটির দিনটা কাটছে! একজনের অঙ্কে বারো পেয়ে খাওয়া বন্ধ,

একজনের শরীর খারাপ, বাপ গেলেন মাছ ধরতে। যাই আমি একাই খানিকটা গিলে আসি।"

তাই বল! দাদা অঙ্কে বারো পেয়েছে বলে দাদার খাওয়া বন্ধ। কাল দাদা আমাকে কয়েকটা রঙিন খড়ি দিয়েছিল। বালিশে মুখ গুঁজে খানিকক্ষণ শুয়ে থাকলাম।

পিসিমা খেয়ে দেয়ে এসে পাশের ঘরে মাটিতে মাছর পেতে শুয়ে পড়লেন। আমাকে ডেকে বললেন—"কুকুর-বাচ্চাটার কি করলে? ও-সব নোংরা জিনিস ঘাঁটো বলেই তো শরীর খারাপ হয়। এখন থাক চুপ করে শুয়ে, তোমার রিপোর্ট হারানোর কথা শুনলে তো আছে বিকেলে আরেক পালা। তোমরা দুটি মানিক-জোড়! নাও, এখন ঘুমোও তো!'

একটু পরেই সুড়ুৎ সুড়ুৎ করে পাখি উড়ে যাওয়ার মতো আওয়াজ করে পিসিমা নাক ডাকাতে লাগলেন।

আমিও উঠে পড়ে বাগানে চলে গেলাম। দাদা কাঁটাঝোপের ছায়ায় টাইগারকে নিয়ে খেলা করছে। বললাম—"দাদা, চল, টাইগারকে নিয়ে কোথাও চলে যাওয়া যাক!"

দাদা বললে, "কোথায় যাবি?"

"কেন মামাবাড়িতে, মার কাছে। ওরা টাইগারকে দেখে খুব খুশি হবে। ওরা কুকুর ভালোবাসে, বেড়াল ভালোবাসে, কাকাতুয়া ভালো-বাসে, খরগোশ ভালোবাসে। চল দাদা, হেঁটেই চলে যাওয়া যায় না?"

দাদা মাথা নাড়ল, "না রে, সে আনক দূর। জানিস, আমার এ বছর সার্কাস ভাখা বন্ধ, সিনেমা ভাখ্যা বন্ধ, আসছে রবিবার মা এলে তোরা সবাই পিকনিক যাবি, আমি যাব না।"

আমি উঠে পড়ে দাদার হাত ধরে হিড়্‌হিড়্‌ করে টেনে অনেকটা এগিয়ে আনলাম।

"দাদা তুই একটা স্টুপিড্‌! অঙ্কে বারো পাস কেন। আমি

তো বত্রিশ পেয়েছি।"

দাদা কোনো উত্তর না দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিল।

কুকুর-বাচ্চাটা এ-সব দেখে মহা কেঁই-কেঁই জুড়ে দিল। তাকে আবার কোলে নিতে হল।

দাদা বলল—"ওকে কোথায় পেলি?"

"শিকদারদের মালী ওকে বেচে দিয়েছে। ওর মার সাতটা বাচ্চা হয়েছিল। একটা রেখে সব-কটা বিলিয়ে দিয়েছে। বুড়ো শিকদার-মশাই নাকি বলেছেন, একটা রেখে সব-কটাকে জলে ডুবিয়ে দাও।"

'ই-স! কি নিষ্ঠুর!"

"মালী কিন্তু জলে ডুবোয় নি। চার-আনা করে দামে বেচে দিয়েছে। বলেছে নাকি বিলিতি কুকুরের খুব দাম হয়। আমি চার আনা দিয়ে ওকে কিনেছি।"

"পিসিমাও ওকে রাখতে দেবে না, আর বাবাও দেবে না। কুকুর-বাচ্চা কেন জন্মায়?

"এই টাইগার, তুই জন্মালি কেন? তোকে কেউ চায় না।" টাইগার তাই শুনে আনন্দের চোটে আমার কোলে নেচে-কুঁদে, ল্যাজ নেড়ে, ঘেউ-ঘেউ শব্দ করে একাকার! দাদাকে বললাম—"বাবা কক্ষনো ওকে রাখতে দেবে না, দাদা। আমার রিপোর্টটা কোথায় হারিয়ে গেছে।"

দাদা বিরক্ত হয়ে টাইগারকে একটু ঠেলে দিল, টাইগার মহা খুশি হয়ে ছুটতে ছুটতে এসে, দাদাকে খেলা করে কামড় দিতে লাগল। ছোট্ট ইঁদুরের ল্যাজের মতো ল্যাজ, নড়ে নড়ে খসে পড়বার জোগাড়।

দাদা রাগ-রাগ গলায় বলল—"জেনে-শুনে আনলি কেন? বাবা যদি রামদীনকে বলে ওকে জলে ডুবিয়ে দিতে?"

"ইস, বাবা কক্ষনো বলবে না।"

"আজ বলতে পারে।"

আমি চুপ করে রইলাম।

দাদা টাইগারকে কোলে নিয়ে বলল—"চল, চলে যাই। বাবা বলেছে আমার লেখাপড়া হবে না। তা হলে তোরও বোধ হয় হবে না। হেঁটে-হেঁটেই মামাবাড়ি চল। কত লোক তো হেঁটে-হেঁটে জগন্নাথ দেখতে পুরী যায়।"

তখন আমরা আস্তে-আস্তে পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। দাদার পায়ে জুতো ছিল, আমার খালি পা, হাঁটতে-হাঁটতে বিকেল হয়ে গেল। আমার জল-তেষ্টা পাচ্ছিল, পা ব্যথা করছিল। কত সব বাড়ি-টাড়ি ছাড়িয়ে চলে গেলাম, পাড়াগাঁ সব এসে গেল। এক জায়গায় একজনের বাড়িতে জল খেলাম, টাইগারও খেল।

বিকেল হয়ে গেল, সন্ধে হয়ে গেল। দাদা হাঁটছে তো হাঁটছেই। শেষটায় আমি একটা বড় গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে পড়লাম। "দাদা, আমি আর হাঁটতে পারছি না।"

দাদা আমার পাশে বসে আমার পায়ের গুলি টিপে দিতে লাগল। আমি কোলের উপর টাইগারকে নিয়ে পা ছড়িয়ে বসলাম, আর দাদা আমার পা টিপে দিল। শেষটা দুজনেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

যখন রাত আটটা-নটা হবে, বাবা এসে আমাদের বাড়ি নিয়ে গেল। গাড়ি নিয়ে খুঁজে খুঁজে দেখল গাছতলায় তিনজনে ঘুম লাগাচ্ছি।

দাদা গাড়িতে উঠে টাইগারকে জাপটে ধরে বাবাকে বলল—"খুব ভালো বিলিতি কুকুর বাবা। মণ্টু চার-আনা দিয়ে কিনেছে। বড় হয়ে খুব ভালো শিকারী-কুকুর হবে। আমাদের বাড়ি পাহারা দেবে।"

বাবা কিছু না-বলে গাড়ি চালাতে লাগল।

তখন আমি কেঁদে ফেলাম—

"তুমি কি ওকে জলে ডুবিয়ে মেরে ফেলবে? ওর নাম টাইগার।"

বাবা খ্যাচ্ করে গাড়ি থামিয়ে আমাদের বলল—"কেন, আমি কি একটা পাষণ্ড?" আমরা কেউ কিছু বললাম না দেখে আরো বলল—"বেশ নাম টাইগার। একটা কলার কিনতে হবে, লাইসেন্স করাতে হবে।"

আমি বললাম, "লাইসেন্স কেন করাতে হবে বাবা? গাড়ির লাইসেন্স তো আছে।"

দাদা বলল, "স্টুপিড্! ফুল!"

বাবা বলল, "আমি যখন ছোট ছিলাম, একটা নেড়িকুত্তোকে বাড়িতে এনেছিলাম। আমার বাবা তাকে কিছুতেই বাড়িতে ঢুকতে দেবে না, সেও কিছুতেই যাবে না। রোজ আমাদের দারোয়ান তাকে ঠেঙিয়ে তাড়িয়ে দিত, আর রোজ সে ঘুরে-ঘুরে ফিরে আসত। শেষটা দারোয়ানের ভাই একদিন তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল। লোকটা ভালো ছিল। ঐ কুকুরটার নাম দিয়েছিলাম 'বাঘা'।"

টাইগার কি বুঝল জানি না, এই পর্যন্ত শুনে হঠাৎ বাবার কনুই কামড়ে দিল। আমি তো ভয়ে আধমরা। বাবা জায়গাটা একটু ঘষে বলল, "আরে! ব্যাটার তো এরই মধ্যে খুব দাঁতের জোর হয়েছে!"

প্রশংসা পেয়ে টাইগার আহ্লাদে আটখানা হয়ে মাথা দিয়ে বাবাকে প্রাণপণে ঠেলতে লাগল।



বুচকি

ট্রেনটা থামতেই একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে টুপ করে ঐ অত-খানি উঁচু থেকে নেমে পড়ল গাবি। জায়গাটা কিছু একটা সত্যিকার স্টেশনও নয়। স্রেফ আঘাটা। সামনে পেছনে কোথাও কোনো স্টেশনের চিহ্নও দেখা গেল না। দুপাশের খেতের ধান কোন্‌কালে কাটা হয়ে গেছে, তারপর আর কিছু পোঁতা হয়নি। হয়তো জলের অভাব। ন্যাড়া মাঠগুলোয় ঠিক যেন খোঁচা দাড়ি বেরিয়েছে। খেতের মাঝখান দিয়ে একটা খাল গেছে। তাতেও জল নেই, তলা দেখা যাচ্ছে। চারদিকে তাকিয়ে দেখল গাবি, কোথাও কিছু চোখে পড়ল না, শুধু দূরে একটা পুকুরই হবে নিশ্চয়, উঁচু পাড়ি, চারদিক তালগাছে ঘেরা। একবার কাকুর সঙ্গে গাড়িতে সিউড়ি যেতে এই রকম পুকুর দেখেছিল গাবি। তাতে জল ছিল না। নিচে খানিকটা পাতলা কাদায় কি যেন খপ-খপ করছিল আর গাঁয়ের ছেলেরা খালি গায় কাদায় নেমে ছেঁড়া গামছায় ন্যাটা মাছ ধরছিল।

কি ভালো এই জায়াটা। চারদিকে বিকেলের লালচে রোদ। মাথার ওপর দিয়ে একঝাঁক বুনো হাঁস প্যাঁক-প্যাঁক-প্যাঁক বলে ডাকতে ডাকতে তীরের ফলার মতো হয়ে, উত্তর দিকে উড়ে গেল। কাকু বলেছিল ওরা শীতের আগে আমাদের দেশে আসে আর শীত

কেটে গেলে হিমালয় পেরিয়ে আরো উত্তরে উড়ে যায়। কাঁধের থলিটা খুব হাল্কা নয়।

বেশ জায়গাটা। গাবির গায়ে হাতকাটা ময়লা সার্ট, দড়িবাঁধা নীল ইজের ; পায়ে মলিদিদির সেই আরামের কালো চটিজোড়া, যেটা গাবি পায়ে দিলেই ওরা চটে যায়। হাত-পায়ের আড়মোড়া ভাঙার জন্য থলিটাকে নিচে নামিয়ে রাখল গাবি।

থলি বলল, 'কেউ'। জামা ইজের ঝেড়ে-ঝুড়ে, কাকুর দেওয়া নতুন মনিব্যাগটা একবার খুলে দেখা গেল। ভিতরে শুধু একটা এক টাকার নোট। খুচরোগুলো বাঁদর-বিস্কুট কিনতেই গেছে। তবু এক টাকাই বা কম কিসে ?

চমৎকার একটা হাওয়া দিতে লাগল। কাকু বলেছিল এ বছর অনেক দিন শীত ছিল বলে শিমুল পলাশ ফুটছে কৃষ্ণচূড়োর সময়। কাল রাতে খুব একচোট বৃষ্টি হয়ে গেছে, তাই অনেক শিমুল ফুল বনের ধারে গাছের গোড়ায় ঢিপি হয়ে রয়েছে। পা দিয়ে একটু নাড়তেই কি রকম একটা সোঁদা গন্ধ নাকে এল। হাঁচি পেল।

ন্যাড়া ধানখেতের মাঝখান দিয়ে একটা গরুর গাড়ির পথ গিয়ে, উঁচু হয়ে, একটা পুলের ওপর দিয়ে শুকনো খালটাকে পেরিয়েছে। সব চেয়ে উঁচু জায়গাতে নীল আকাশের গায়ে আঁকা ছবির মতো দেখতে একটা গরুর গাড়ি চলেছে। গাবি সেই পথে হাঁটা দিল। বোধ হয় কাল রাতের বৃষ্টির জন্য ধুলোগুলো বসে গেছে, পায়ের নিচে নরম মাটিতে হাঁটতে ভারি ভালো লাগল।

আরো অনেকটা হাঁটল গাবু। নতুন বাঁধের রাস্তা, দুদিকে গাছের ছায়ার বালাই নেই। ছোট ছোট বাবলা, মুচুকুন্দ, কাঠচাঁপা। এতদূর হাঁটেনি কখনো গাবি। বাড়ি থেকে স্কুল, কিংবা বাড়ি থেকে বাজার, বা বড়-মুদীর দোকান ; কি ভালো ভালো মটকা, কদমা আর পিচ বোর্ডের মুখোস রাখে বড়-মুদী। ঐটুকু যেতে দিতেও ঠামুর কি আপত্তি। আর মলিদির তো কথাই নেই। বাঞ্ছারাম সঙ্গে যাক। নয়

তো হয় গাড়ি চাপা পড়বে, নয় তো ছেলেধরায় ধরবে। একটা আট বছরের ছেলেকে ধরে কখনো ছেলেধরায়?

মলিদি হল ঠামুর ছোট বোন। দিদিদের স্কুলে ভূগোল পড়ায়। নাকি বিলেত গেছিল একবার। দেখে তো মনে হয় না। খালি এটা করো না, ওটা করো না, রোদে যেও না, সর্দিগর্মি হবে, মাথা ঘুরবে, জ্বর আসবে। কই, এই তো এতটা পথ রোদে হাঁটা গেল। মাথা ঘুরল, নাকি জ্বর এল? তবে পায়ের পাতাটা একটু একটু ব্যথা ব্যথা করছিল। তার ওপর ঠিক এই সময় ফট্ করে মলিদির কালো চটির বড় স্ট্র্যাপটা দু টুকরো হয়ে ছিঁড়ে গেল।

পথের পাশে খোয়ার ঢিপি। তার ওপর বসে পড়ল গাবি। অমনি থলিটা বলল, 'কেঁউ'।

কি আশ্চর্য! এতক্ষণ গাবি বুচকির কথা মনেই ছিল না। এখন থলির মুখ খুলতেই একটা মাস তিনেকের কালো কুকুর-বাচ্চা চোখ পিটপিট করতে করতে বেরিয়ে এল। মোলায়েম লোম, কটা চোখ, সরু ল্যাজ, সর্বাঙ্গে একটা নেড়ি-নেড়ি ভাব হলে কি হবে, বেজায় মিষ্টি। থলি থেকে বেরিয়েই মাথা দিয়ে গাবিকে ঠেলতে লাগল। পকেট থেকে ঠোঙা বের করে, অগত্যা তাকে আগে দু-চারটে বাঁদর বিস্কুট দিতে হল।

মাথার ওপর দিয়ে প্যাঁক-প্যাঁক-প্যাঁক করতে করতে আরেক ঝাঁক বুনো হাঁস উড়ে গেল।

গাবির সমস্ত শরীরটা শিরশির, চিড়চিড় করে উঠল। আর বসে থাকা যায় না। এই পথটাও উত্তর দিকে গেছে। হাঁটতে হাঁটতে শেষটা হিমালয় পৌঁছনো যায়। হিমালয়ের খাঁজে খাঁজে অনেক গিরিপথ আছে। তাই দিয়ে সন্ন্যাসীরা আর তিব্বতী বণিকরা সর্বদা যাওয়া-আসা করতেন। ইয়ে—মানে, অনেক দিন হাঁটলে সেখানেও যাওয়া যাবে আর বুচকিকেও কেউ নিয়ে নিতে পারবে না। বুনো হাঁস কোথায় যায় দেখতে হবে।

থলেটাকে কাঁধে ঝুলিয়ে, বুচকিকে বগলে নিয়ে গাবি হাঁটতে লাগল। কি এমন খারাপ কুকুর বুচকি? শিশি বোতলওয়ালার পেছনে কাল এসে বাড়িতে ঢুকেছিল। নাকি সারা সকাল তার সঙ্গে ঘুরেছিল।

সে নিজেই বলল, "উঠোকে রাখেন বাবুজি, বিলিতি কুকুরও হতে পারে। এরই মধ্যে তো তিন-চার আদমিকে কেমড়িয়েছেন। তাই রেখে দিয়েছিল গাবি। আর কাকু রাতে বাড়ি এসে, বুচকিকে দেখে হাত পা নেড়ে সে যে কি চ্যাচামেচি লাগিয়ে দিল ভাবা যায় না। সে নাকি ভালো কুকুর আনবে, হেনা-তেনা কত কি। মলিদিও ঐ সঙ্গে জুটল।

শেষটা ঠামু যখন বলল, "আজ রাতটা থাক। কাল সকালে যেখানে হয় ছেড়ে দিয়ে এলেই হবে।" গাবি বলেছিল, "তা হলে না খেয়ে মরে যাবে না বেচারি?" শুনে সকলের কি হাসি। "অ্যাদ্দিন কে ওকে দুবেলা মাছ-ভাত দিয়েছে শুনি? রাস্তার কুকুর-বাচ্চা আবার না খেয়ে মরে নাকি?"

শেষ পর্যন্ত ঘুম থেকে উঠেই, আর কেউ জাগবার আগেই চলে আসতে হয়েছিল। বাড়ির কাছেই স্টেশন, অত ভোরে কেউ বড় একটা ছিলও না। কাকুর মাছ ধরার থলিতে বুচকিকে পুরে অগত্যা রওনা দেওয়া। মাছের গন্ধ পেয়ে বুচকি কোনো আপত্তি করেনি। গাবি নিজে মুখও ধোয়নি, দাঁতও মাজেনি। ঠিক হয়েছে। মানিব্যাগে বাপি মামণির দেওয়া এক টাকা ত্রিশ পয়সা ছিল। তার তিরিশ পয়সা দিয়ে বুচকির বিস্কুট কেনা হয়েছে। বাপি মামণি বোম্বাই থেকে ফিরে নিশ্চয় কাগজে বিজ্ঞাপন দেবে। বিজ্ঞাপন দেখলেই গাবি ফিরে আসবে।

কিরির কিরির বঁক বঁক করতে করতে একটা অদ্ভুত মোটরগাড়ি পাশে দাঁড়াল। কালো ময়লা প্যান্ট শার্ট আর একমুই দাঁড়ি-গোঁফ নিয়ে একটা রোগা লোক ঝুপ করে নেমে পড়ে বলল, 'চলেন স্যার, বড়ই একা পড়েছি। আর আপনারও তো এক পায়ে চটি। নিন

উঠুন, পানাগড়ের ফালতু পার্টের দোকান থেকে কিনে, পার্টগুলো জুড়ে জুড়ে ক্যায়সা একখানা বানিয়েছি বলুন। সাধে বলে ঘরে তৈরি জিনিসের তুলনা হয় না।'

কোনো কথা না বলে গাবি উঠে লোকটার পাশে বসে পড়ল। উফ্, এতক্ষণে পা দুটোতে আরাম হল।

লোকটা বলল, "থলি কাঁধে, এক হাতে চটি, এক হাতে কুত্তো, চলেছেন কোথায়? আমার আবার একটা কাজের লোকের দরকার। করবেন নাকি?"

গাবি বলল, "করতে পারি, যদি বুচকিকেও থাকতে দাও। বুচকি নেড়ি কুত্তো। রাস্তা থেকে এসেছে। কামড়ায়।"

লোকটি মহা খুশী। "ওয়া! তাহলে তো কথাই নেই। আমাদের ক্যাম্প পাহারা দেবার জন্য ঐ রকমেই খুঁজছিলাম। আর বাড়তি খাবার-টাবার খেয়ে ফেলার জন্য একটা লোক। খাবার নষ্ট করতে নেই কি না।" লোকটাকে কেন জানি খুব চেনা চেনা মনে হল।

অদ্ভুত লোকটা। সারাদিন ঘুরল গাবি ওর সঙ্গে। একটা পুলের পাশে বাবলা গাছের নিচে গাড়ি থামিয়ে, দুটো বাবুই-বাসা পেড়ে লোকটা আবার গাড়িতে উঠে বসল।

গাবি বলল, "কি করবে?"

"বাসা পাতব। ক্যাম্পের ছাদের কোণায় ঝুলিয়ে রাখব। বাবুইরা নিজেই এসে ডিম পাড়বে। তবে ঘাঁটাঘাঁটি করলে, মানুষের গন্ধ পাবে অমনি চলে যাবে। মানুষ বড় খারাপ জিনিস।"

সে বিষয়ে গাবিও এক মত, তাই খুশী না হয়ে পারল না। লোকটা বলল, "বেড়ে বানিয়েছে। তলায় কেমন একটেরে করে যাওয়া-আসার পথ করেছে। পাশের দেয়ালে খাপের :মধ্যে ডিম থাকে, বাসা দুললেও পড়বার ভয় নেই। থাপের পাশে একদলা মাটি দেখেছ?"

গাবি তো অবাক! "মাটি কেন? তাতে আবাব কালো পোকা গোঁজা কেন? খায় বুঝি?"

লোকটা আশ্চর্য হয়ে গেল। "কিছুই জান না দেখছি। ওটা জোনাকি পোকা। সারারাত ডিমে তা দিতে হবে না? বাচ্চা ফুটলেই তো আর তার চোখ ফোটে না। শেষটা অন্ধকারে মাড়িয়ে-টাড়িয়ে একাকার করার ভয় আছে না? তাই ঘরে আলো দেবার জন্য, জোনাকি ধরে, নরম মাটিতে গুঁজে রাখা হয়।"

সারাদিন লড়ঝড় করতে করতে কত কি দেখল ওরা। খরগোশের বাসা; মাটির ওপরে ঝোপে-ঝাড়ে ঢাকা একটি গর্ত। যেই না বুচকি খরগোশকে তেড়ে গেল, অমনি টুপ করে তার মধ্যে ঢুকে পড়ল। ভিতরে নাকি গলি-ঘুঁজি ভরা শহরবিশেষ। মৌ-টুসির বাসা। ছোট্ট একটা বাবুই-বাসার মতো, কিন্তু বেরুবার পথ ওপরে, আর বাসার গায়ে নরম শণ, পাট লাগানো, মাছের আঁশ দিয়ে সাজানো। সাপের খোলস। তাকে নির্মোক বলে। সারা শীত ঘুমিয়ে থেকে সাপ রোগা হয়ে গিয়ে, পুরনো, খোলসের মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়ে। নতুন খোলস গজায়। পুরনোটা গাছের ডালে ঝুলে ছিল। মনে হচ্ছিল শুকনো সাপ বুঝি। গাবি ভয় পেয়েছিল।

দুপুরে লোকটা একটা গাঁয়ের দোকান থেকে মুড়ি, পেঁয়াজি আর তালের পাটালি খাওয়াল। তারপর কখন সন্ধ্যে হয়ে গেল বোঝাই গেল না। আর গাবি ঘুমিয়ে পড়ে থাকবে। ঘুম ভাঙল ক্যাম্পে পৌঁছে। ক্যাম্পে মানে একটা আমবাগানের ধারে চার পাঁচটা ফেলে দেওয়া পুরনো বাস্ দিয়ে সে যে কি চমৎকার বাড়ি তৈরি হয়েছে সে আর কি বলব। তারই একটাতে গাবিদের টেনে তুলে গরম হাত-রুটি আর মাংসের ঝোল খাওয়াল লোকটা। ক্যাম্পের অন্যদের জিজ্ঞাসা করল, "মালিক এসেছেন?"

সঙ্গে সঙ্গে কাকুও এসে উপস্থিত। ঐ নাকি মালিক!

কাকু বলল, "কিরে ব্যাটা, আমার ক্যাম্পটা কেমন মনে হচ্ছে?"

প্রায় ঘুমিয়েই পড়েছিল গাবি, কাকুর কথায় লাফিয়ে উঠে বলল, "এইটা তোমার ক্যাম্প? এইখানে তুমি রোজ আস নাকি?"

"নিশ্চয় আসি। তবে একটা হিংস্র পাহারাদার কুকুর দরকার এখানে, বুচকিকে রেখে যাবি নাকি?"

তখুনি দাড়ি-গোঁফওয়ালা লোকটার হাতে গাবি বুচকিকে তুলে দিয়ে, শুয়ে প্রায় ঘুমিয়ে পড়ল। একবার মনে হল সে লোকটা এক-টানে দাড়ি-গোঁফ খুলে ফেলে বাঞ্ছারামদা হয়ে গেল। চমকে সটাং উঠে বসল গাবি। আরে তাই তো! অবাক হয়ে বলল, "তু-তু-তুমি!"

বাঞ্ছারামদা নিজের গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, "উফ্ আর বলেন কেন, স্যার! সারারাত কাল আপনাকে পাহারা দিয়েছি! তারপর ভোর থেকে ঐ মোটর করে রেল গাড়িকে ফলো করেছি! মালিক তো হুকুম দিয়ে ঘুমিয়ে কাদা! তাহলে আমাকে কিছু দেওয়া হোক।

গাবি বলল, "ঐ তো বুচকিকে দিলাম।" বলেই সে কি ঘুম।

শান্তিনিকেতনের চিঠি



অনেক দিন পরে শান্তিনিকেতনে এসে বর্ষা দেখলাম। কখনো বৃষ্টি, কখনো রোদ। যেই না বৃষ্টি থামে, মেঘ সরে যায়, আশ্চর্য নীল আকাশ দেখা যায় আর পাখিরা অমনি গান ধরে। কি সব পাখি। এদের নাকি বসন্তকালে গান গাইবার কথা; কোকিল, পাপিয়া, দোয়েল, টিয়া, বেনে-বৌ টুনটুনি আর খানিকটা কাকের মতো দেখতে মস্ত একটা লম্বা ল্যাজ পাখি। গুব গুব করে ডাকে বলে তার নাম হয়েছে গুব গুব পাখি। সে ঘাসের ওপর নেমে কি যেন ঠুকরে খায়। শীতকালেও ওকে দেখেছি, ভেবেছি ঘাসের পাকা-বিচি খায় বোধ হয়। এখন তো পাকা বিচি পাবে না, নিশ্চয় পোকা-মাকড় খায়।

ঘুঘু-পাখিরাও আসে। আমাদের রঙ্গন-গাছের গোড়ার কাছে বৃষ্টির জল জমলে, সেখানে স্নান করে, রূপোলী ডানা ঝাপটায় আর মনে হয় সত্যি বলছে, 'কেষ্ট ঠাকুর-র-র, ওঠ, ওঠ, ওঠ!' রঙ্গন-গাছে বুলবুলিরা থাকে, তাই শুনে তারা ব্যস্ত হয়ে শিস্ দেয়। আরেক পস্‌লা বৃষ্টি পড়বার আগে ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়া পাখিরা চরতে বেরিয়ে পড়ে। রোজ ভোর সাড়ে চারটায় পাখিরা আমাদের ঘুম ভাঙায়।

বৃষ্টি পড়লেই অমনি সব চুপ।

বাতাস বইলেই গাছের পাতার মধ্যে শুনি শির—শির—সর—সর। ছোটবেলায় কথা মনে পড়ে। শিলং পাহাড়ের পা থেকে মাথা পর্যন্ত ছিল সরল-গাছের বন। তাদের লম্বা লম্বা ছুঁচের মতো পাতার মধ্যে দিয়ে সারা বছর অষ্টপ্রহর কেমন একটা শেঁা—শেঁা শব্দ উঠত, দীর্ঘ-নিশ্বাসের মতো কানের ওপর শাঁখ ধরলে তার মধ্যে যেমন শব্দ শোনা যায়, সেই রকম। সে আওয়াজে মন উদাস হয়ে যেত। কিন্তু শান্তিনিকেতনের একেলিয়া, মুচুকুন্দ, জারুল, বকুল, সোনাপুরি, পলাশ, আম, জাম, কাঁঠাল গাছে বর্ষার হাওয়া লাগলে তারি একটা হৈহুল্লোড় পড়ে যায়, কেমন একটা ছুটো-ছুটি, দাপা-দাপি, ঐ এল! ঐ এল! ভাব। মনটা চকিত হয়ে ওঠে। ইচ্ছে করে খুব খানিকটা ছুটোছুটি করি।

আর দেখি শান্তিনিকেতনের কুকুরদের কাণ্ড। বর্ষাকালেও তারা খুব একটা অসুবিধা বোধ করে না। যা হোক একটা ব্যবস্থা করে নেয়। এর বাড়ি খাওয়া, ওর দাওয়ায় শোয়া, রাতে তার বাড়ি পাহারা দেওয়াই যাদের স্বভাব, তারা মিছিমিছি বৃষ্টিতে ভিজবে কেন? বাড়ির লোকদের যদি জায়গা হয় তাদেরি বা হবে না কেন? যেখানে গাল-গল্প চা-জল-খাবার চলছে, সেই জায়গা ওদের সব চাইতে পছন্দ। তাড়ালেও যাবে না। এমনিতে বেশ ভদ্র! খাবার-দাবার না দিলে তুলে কিংবা ছিনিয়ে নেবে না তবে ছোঁক-ছোঁক করে বেড়াবে এবং তাড়ালেও যাবে না। এত ভদ্র যে ওদের বেশি মারতেও পারা যায় না। মারলেও ওদের বেশি এসে যায় না; বড় জোর চোখ বুজে মাথা কাৎ করে, যেমন শুয়েছিল, তেমনি থাকে। মোড়ার তলা দেখালে একটু ঘাবড়ে যায়, বারান্দার ডান দিকের সিঁড়ি বেয়ে নেমে যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বাঁ দিকের সিঁড়ি দিয়ে আবার উঠে বসে। অন্য পাড়ার কুকুর না এলে কোনো শব্দও করে না। একবার দেখেছিলাম কবি অন্নদাশঙ্কর রায়ের কুকুর মাঘোৎসবের উপাসনার

সভার মধ্যে ঢুকে, সবাইকে ঠেলে-ঠুলে একেবারে আচার্যের মুখের সামনে গিয়ে বসল। আর শুধু বসল না, আড়াই ঘণ্টা উপাসনা ও গান শুনে বিনা বাক্য ব্যয়ে চলে গেল। ঐ সব প্রাণীর বর্ষায় আর কি অসুবিধা হতে পারে ?

কুকুর বলতে মনে পড়ল তোমাদের অজেয়দাদের আরেকটি কুকুর জুটেছে। সে সকলের জুতোর ওপরের দিকটা চিবোয়, রবারের জুতোরও। মুচি দিয়ে না সারালে পরবার জো থাকে না। তাতে মুচির প্র্যাক্‌টিস্ খুব বেড়ে গেছে। সে কুকুরটার ওপর খুশি না হয়ে পারে না। প্রায়ই পিঠ চাপড়ে সে টুকিটাকি খাওয়ায়। অজেয়দাদের বাড়ির লোকদের অবিশ্যি অন্য রকম মনের ভাব। জুতো সেলাই বাবদ প্রতি মাসেই তাদের বেশ কিছু গচ্ছা যাচ্ছে।

একদিন হয়েছে কি, মুচি এসে নিয়মমাফিক এক গাদা কুকুর-বিধ্বস্ত জুতো-চটি মেরামত করে, নগদ পয়সা পকেটে ফেলে হাসিমুখে সদর দরজা দিয়ে বেরিয়েই, মহা খাপ্পা হয়ে আদরের চাকরটাকে গালাগালি দিতে আরম্ভ করেছে! কি ব্যাপার ? না মুচি যতক্ষণ ভিতরে বসে কুকুর-খাওয়া জুতো-চটি সেলাই করছিল, কুকুর বাছাধন ততক্ষণ সদর দরজার বাইরে রাখা মুচির নিজের চটি জোড়ার উপর দিকটা চেটে-পুটে সাবাড় করে রাখছিল !!

শান্তিনিকেতনের কুকুরদের কথা বলেছি কি ? তারা হল খাস্ দিশী কুকুর, বিলিতী কুকুরও নয়, নেড়ি-কুত্তোও নয়। এরা হয়তো সেকালের শিকার কুকুরদের বংশধর। হয়তো দুহাজার বছরের বেশি স্থানীয় আদিবাসীদের নিত্য সঙ্গী। কুকুর যে কবে থেকে মানুষের সঙ্গ নিয়েছে তা বলা যায় না। পুরনো সব গুহার গায়ে মাঝে মাঝে, হয়তো চার হাজার বছর আগেকার আঁকা ছবি দেখা যায়। গুহার পাথুরে দেয়ালে গেরি মাটি দিয়ে রঙ করা, ছুচলো পাথর দিয়ে আঁচড় কাটা জন্তু জানোয়ারের ছবি। অদ্ভুত চেহারার সেকালের ঘোড়া, গণ্ডার হাতির

ছবি। তীর-ধনুক-হাতে মানুষের ছবি আর মানুষের সঙ্গে কুকুরের ছবি।

শুধু ভারতে নয় প্রাচীন মিশর দেশে, অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্ ঐতিহাসিক আদিবাসীদের গুহায়, ফ্রান্সের পুরনো গুহায়, এইসব কুকুরের ছবি দেখা যায়। শান্তিনিকেতনের দেশী কুকুররা অনেকটা তাদের মতো দেখতে। মাপে খুব বেশি বড় নয়; মিহি পাতলা গড়ন; তীরের মতো চলা-ফেরা; ছোট মাথা, খাড়া কান, তোলা ল্যাজ; সূক্ষ্ম সুন্দর থাবার গঠন, হঠাৎ দেখলে হরিণের কথা মনে হয়। দুঃখের বিষয় গত কুড়ি বছরের মধ্যে এরা সংখ্যায় বড্ড কমে গেছে। হয়তো বাইরে থেকে বড় মাপের, ভারী শরীরের, খেঁকি স্বভাবের নেড়ি কুত্তোরা এসেই এদের বংশের ধ্বংস করছে।

এদের গায়ের রঙ বেশির ভাগ-ই পাটকিলে, এখানকার শুকনো কাঁকরমাটির সঙ্গে মিলিয়ে থাকে। চোখের কোণে নাকের দু পাশে দুটি ঘি রঙের জিজ্ঞাসার চিহ্নের মতো দাগ থাকে। এরা দেখতে বড় সুন্দর। ভারি সাহসী, প্রভুভক্ত, কর্তব্য-পরায়ণ। তবে আজকালকার জগতের আবহাওয়া ওদের এখনো অভ্যাস হয়নি; হতে হতে হয়তো ওরা একেবারেই লোপ পেয়ে যাবে। আপাততঃ কখন কি করা উচিত, তাই নিয়ে ওরা একটু ধাঁধায় পড়ে যায়।

অথচ ওদের নিজেদের যে নানারকম নিয়ম-কানুন আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু সে নিয়মগুলোও হল জীবনের নিয়ম। যখন নিরাপত্তার জন্য আদিবাসীরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে বাস করত। নিজেদের সম্পত্তি সম্বন্ধে তারা আধুনিক সমাজের মতো অতটা সচেতন ছিল না। খাবার-দাবার, গুহার সুখ-সুবিধা, নিরাপত্তার ব্যবস্থা সব-ই ছিল সমস্ত দলের সাধারণ সম্পত্তি। একজন দলপতি হয়তো থাকত, সে-ই যার যেমন দরকার অনুসারে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দিত। দলের পশুপাখিদের বেলাও তাই। তারাও দলের জিনিস, দল তাদের খাওয়াত, দলটাকে তারা পাহারা দিত।

এখন সব বদলে গেছে, কিন্তু এই অভ্যাসটি যায় নি। মানুষরা ওদের খাওয়াবে, ওরা মানুষদের পাহারা দেবে। মুশকিল হল যে আজকাল মানুষরা আলাদা আলাদা বাড়িতে থাকে, খায়। কার বাড়িতে খেয়ে, কাকে পাহারা দিতে হবে, ওরা সব সময় বুঝে উঠতে পারে না। তোমাদের অজেয়দাদের কুকুরের কথাই ধর না কেন। অজেয়দা মানে অজেয় রায়, যিনি শান্তিনিকেতনে থাকেন এবং তোমাদের জন্য গল্প লেখেন।

ওঁদের বাড়িতে একটা দিব্যি মোটাসোটা কুকুর দেখলাম, দেখেই বুঝলাম খুব যত্নে লালিত-পালিত। ওর খাওয়া-দাওয়া, ওষুধ-পথ্য, স্নানাদির ব্যবস্থা বাড়িসুদ্ধ সবাই দেখেন। কুকুরটাও ওঁদের খুব ন্যাওটা, বাড়িতে কেউ গেলে তার যত্ন-আত্তি করে। রাতে পেট ভরে খাইয়ে-দাইয়ে ওকে ছেড়ে রাখা হয়। জানই তো কুকুররা হল শ্বাপদ, নিশাচর। আর ছেড়ে না রাখলে পাহারাই বা দেবে কি করে। যেই না ছাড়া পাওয়া, অমনি অজেয়দাদের কুকুর পাঁই-পাঁই করে ছুটে কিছু দূরে আরেকজনদের বাড়ি গিয়ে, সারারাত জেগে পাহারা দিয়ে, সকালবেলা ক্লান্ত দেহে বাড়ি ফিরে এসে স্নান-খাওয়া ঘুম ইত্যাদি করে।



কুঁকড়ো

তা অমন সুন্দর পাখি, ঘরে একটু ময়লা করলে কি হয়—কুমু ভেবে পায় না। দেখতে দেখতে শুকিয়ে খরখর করে, কুমু হাতে করে তুলে ফেলে দেয়। হাত-ও ধোবার দরকার হয় না। কেউ টেরও পায় না। এক যদি না দেখে ফেলে। এত রাগের কোনো মানেই হয় না, কাকীর খোকাটা কি কম নোংরা, যাক্ গে সে কথা।

কাকী নাকি ভারি সুন্দরী, সবাই তাই বলে। শুনে কুমুর হাসি পায়। কুঁকড়োর কাছে ঐ কাকী! কুঁকড়োর মতো সাদা ধবধবে গা, হল্‌দে চক্‌চকে পা, লাল টুক্‌টুকে ঝুঁটি আছে কাকীর? প্রথমটা ছাড়েনি কুমু। আড়চোখে বাবার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'ময়লা করলে তো আমি ফেলি। কুঁকড়োকে রাতে কাঠ-গুদোমে রাখলে, কাকীর মুন্নুকে সেখানে রাখতে হবে।'

কাকী রেগেমেগে মুন্নুকে কোলে তুলে, দুমদুম করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছিল। রাগের চোটে খোঁপা খুলে গেল, এক রাশি কালো কোঁকড়া চুল পিঠে ছড়িয়ে পড়ল। মুন্নু তার এক মুঠো মুখে পুরে কেশেটেশে একাকার।

তখন বাবা বলল, 'ছিঃ, কাকীকে কড়া কথা বলতে হয় না। ছেলেমানুষ তো।' কুমু শুনে অবাক। ঐ বুড়োধাড়ি নাকি ছেলে-মানুষ, বাবা যে কি বলে! কুঁকড়োর গলা জড়িয়ে সে আবার শুয়ে

পড়বার চেষ্টা করল। কিন্তু কুঁকড়ো থাকলে তবে তো! বাইরে খড়ের গাদায় চড়ে, সে ডানা ঝাপটাতে লাগল। কি ভালো দেখতে কুঁকড়ো। যখন এন্তটুকু তুলোর গুলির মতো ছিল, তখন কাকুই এনে দিয়েছিল। কিন্তু আজকাল ওকে দেখলেই বলে—'ইস্, জিবে জল আসছে যে রে কুমু! দে না আমাকে!' অবিশ্যি দেয় না কুমু। রাতে কুঁকড়ো ঘরের কোণে সেঁদিয়ে চুপচাপ থাকত। ভোর হলেই কুমু দরজা খুলে দিত। তার পর একদিন অন্ধকার একটু ফিকে হতেই, খুদে ঘুলঘুলি দিয়ে মুণ্ডু বের করে কুঁকড়ো বলল, কঁকর—কঁকর কুক্রু —কু! বাবা রেগে গেল, "এ্যাই কুঁকড়ো, চোপ।" কুঁকড়ো বলল 'কঁকর কঁকর কঁকর, করবি কি তু? কুক্রু-কু!'

তারপর চোখ লাল করে বাড়িসুদ্ধু সবাই উঠে এসে, কুঁকড়োর গলা ধরে টেনে ঘরের বার করে দিল। কুঁকড়োও অমনি ডানা ঝাপটে, খড়ের গাদায় চড়ে, আকাশের দিকে মুখ তুলে, গলা ছেড়ে ডাক দিল, 'কুক্রু কু, আর কত ঘুমুবি তু?' আর এধার থেকে, ওধার থেকে, বাঁশবাগানের ওপার থেকে, শিমলি-নদীর ঘাট থেকে, পাহাড়-তলীর বাট থেকে, পঁচিশ পাখি গলা ছাড়ল, 'কুক্রু কু! আছি মু!' আর ঘুমোয় কার সাধ্যি! গা-মোড়ামুড়ি দিয়ে সবাই উঠে পড়ল। সবার মুখ গোমড়া, খালি মুন্নু তার ফোকলা মুখের একটা দাঁত বের বলল, 'কঁক্-কঁক্-কঁক্-কঁক্-কঁক্!' কাকী তাকে ধরে দিল ঝাঁকি। মুন্নু অমনি ভ্যাঁ!

সেই দিক থেকে কুঁকড়োর জায়গা হল কাঠ-গুদোমে। সেখানে পাহাড়তলীর বন থেকে বাবা কাকা কাঠ কেটে এনে, সারা বছরের জন্য রোদে শুকোয়। শুকিয়ে ঠনঠনে হলে কাঠ-গুদোমে তোলে। সেখানে কুঁকড়ো হয়তো সুখেই থাকে। বেড়ে জায়গাটা, ধুনো-ধুনো মিষ্টি গন্ধ, চেলা-কাঠ থেকে সুবাস ছাড়ে। কিন্তু অন্ধকারে একা থাকে কুঁকড়ো। কুমুর কান্না পায়।

একদিন সকালে ঝমরু এসে বলল, "মোরগ আগ্‌লে রাখিস্।

এ-সময় বন থেকে শ্যাল নামে। শীতকালে সব ছোট জানোয়ার লুকোনো জায়গায় ঘুম দেয়। খিদের চোটে শ্যালরা গাঁয়ে আসে।"

কুমু বলল, "আমার কুঁকড়ো কাঠ-গুদোমে শিকলি-বন্ধ থাকে।" ঝমরুর কি হাসি। 'গুদোমের ছাদের আর চালের মধ্যে ফাঁক আছে না? বাইরে খড়ের গাদায় চড়ে সেই ফাঁক দিয়ে ঢুকতে কতক্ষণ।'

'দেখতে পাবে না।' 'গন্ধ পাবে। কুঁকড়োর গায়ে বোটকা গন্ধ। তাছাড়া শ্যালরা অন্ধকারে দেখতে পায়, নইলে রাতে বনে শিকার ধরে কি করে?'

কুমুর বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল। মুখে বলল, 'ধেৎ! বনের জানোয়ার গাঁয়ের মধ্যিখানে ঢুকবার সাহস পাবে না। গাঁয়ের লোকরা তীর-ধনুক নিয়ে তাড়া করবে না!' কিন্তু এর পর রোজ লোকের হাঁস-মুরগি রাতারাতি উপে যেতে লাগল। চারদিকে শেয়ালের পায়ের ছাপ!

রাতটা ভয়ে ভয়ে কাটত। ভোরে কুঁকড়োর কুক্রু-কু শুনে তবে কুমু নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোত! একদিন ঘুম ভাঙতেই মায়ের কাছে শুনল বাস্থ মামাদের বাড়ির হাঁসের ঘরের চাটাইয়ের দেয়ালে গর্ত করে ছুটো হাঁস নিয়ে গেছে। আর তিনটে হাঁসকে মেরে রেখে গেছে। তারা নাকি ধুলোর ওপর পা টান করে পড়ে আছে। গলা কামড়ে নিয়েছে, চারদিকে রক্ত-রক্ত!

কুমুর কান্না দেখে মা ঘাবড়ে গেল। 'আরে কি জ্বালা! বাস্থরা আজ থেকে তীর-ধনুক নিয়ে পাহাড়তলীর পথ পাহারা দেবে। শ্যাল বাছাধনরা কেমন আসে দেখা যাবে।'

সে রাতে মোড়লের বাড়ি থেকে এক-দিন বয়সের ছুটো পাঁঠার ছানা চুরি গেল। কেউ বলল মানুষ নিয়েছে, কেউ বলল শ্যাল। বাঁধানো উঠোন তাই ছাপ পড়েনি। মোড়লের লোকরাও তীর-ধনুক বের করল। মারাও পড়ল কয়েকটা শেয়াল। তাদের লাসগুলো

বাঁশে ঝুলিয়ে গাঁয়ে আনা হল। গায়ে তখনো তীর বেঁধা। মরা শ্যালের গায়ে ছেলে-বুড়ো বাখারির খোঁচা দিতে লাগল। কুমু বাড়ি গিয়ে বমি করে, শুয়ে রইল। দুপুরে ভাত খেল না।

কাকী মহা বিরক্ত। 'এ কি বাড়াবাড়ি, বাপু! তোর কুঁকড়ো তো ঘরেই আছে। শ্যালের যা উপদ্রব! মেরেছে বেশ করেছে। তা একটু আনন্দ-করবে না?' কুমু বলল, 'ওয়াক্!' কাকী পালাল।

সারারাত পড়ে পড়ে ঘুমুল কুমু। পরদিন সকালে কুঁকড়ো চুপ। কাঠ-গুদোমের দরজা খুলে কুমু দেখল চালের কাছে এতটা ফাঁকা, তার নিচে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত। কুঁকড়ো নেই!

চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে কুমু ছুটে বেরিয়ে এল। সব শুনে সবাই চুপ। খালি কাকা বলল, 'তখনি বললাম জিবে জল আসে, আমাকে দে! তা তো শুনলি না!' কুমু সেখান থেকে ছুটে পালাল।

এর পর আরো দু-দিন কাটল। আরো দু-দশটা পাখি ম'ল। চারটে শেয়ালও তীর খেয়ে ম'ল। তাদের শরীরগুলো পরদিন সকালে গাঁয়ে মধ্যিখানে, যেখানে পূজোর সময় যাত্রা হয়, সেই মাঠে একটা তেঁতুল-গাছ, তার ডাল থেকে ঝুলিয়ে রাখা হল। গাঁয়ের সবাই দেখতে এল। ছোটরা দূর থেকে ঢিল ছুঁড়তে লাগল। খুব সাহসীরা কাছে গিয়ে খোঁচাও দিল। কুমুও গেছিল মজা দেখতে। একটা ঢিল-ও ছুঁড়েছিল। তারপর হঠাৎ চোখ পড়ল মরা শ্যালটার জিব ঝুলে আছে, চোখ উল্টে গেছে।

আর কি সেখানে দাঁড়ায় কুমু! এক ছুটে বাড়ি গিয়ে সারাদিন কেঁদে ভাসাল। শ্যাল ম'ল কিন্তু কুঁকড়ো তো আর ফিরে এল না। বগ্‌ড়ি, ঝমরু, শালিনী এরা তো অবাক! মোরগ গেছে শ্যালের পেটে, সে আবার ফিরবে কি করে! কুমু রেগে বকাবকি করতে লাগল। ওরাও সরে পড়ল।

মোড়লের হুকুম—খিদের চোটে শেয়ালের পাল পাহাড় থেকে নেমে এসেছে, তার যেন একটাও বাকি না থাকে! হয় তাড়াও, নয়

মার! গাঁ-সুদ্ধু সবাই খুশি। তীর-ধনুক দা-কুড়ুল নিয়ে সব বেরিয়ে পড়ল। সারাদিন শ্যাল শিকার চলল।

সন্ধ্যেবেলায় বাড়িতে কেউ নেই। মা আর কাকী গেছে ঠাকুর-বাড়িতে, আনন্দ-নাড়ুর জন্য নারকেল কোরা. চাল কোটা হবে। বাবা, কাকা, বড়দাও দলের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে বিকট হৈ হৈ শোনা যাচ্ছে। শেয়ালের পাল এবার মজা বুঝছে। বেশ! ঠিক হয়েছে, ঠিক হয়েছে!

এমন সময় কলা-বাগানের মধ্যে দিয়ে কি একটা সাদা রঙের জানোয়ার মাটিতে গা ঘষটাতে ঘষটাতে, লাল চোখ দিয়ে জল ফেলতে ফেলতে, হাট করে খোলা কাঠ-গুদোমের দরজার কাছে পৌঁছে, মানুষের মতো গোঙাতে গোঙাতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। তার পেটের কাছে দুটো তীর বিঁধে আছে, রক্ত পড়ছে। দূরে, গাঁয়ের লোকদের হো-হো শুনে জানোয়ারটা নিজের শরীরটাকে টেনে টেনে কোনোমতে গুদোম-ঘরে ঢুকে, আবার পড়ে গেল। কুমুর বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করতে লাগল, গলা শুকিয়ে কাঠ।

সঙ্গে সঙ্গে বিকট চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে দু-চারজন বাইরের দরজার কাছে পৌঁছে গেল। কুমু কাঠ-গুদোমের দরজা বন্ধ করে, বাইরে থেকে শিকলি তুলে, দু-ফোঁটা রক্ত পড়েছিল তার ওপর মাটি ছড়িয়ে দিল। ঠিক কুঁকড়োর রক্তের মতো। বাবা কাকা এসে দেখল বাড়ি চুপচাপ, কুমু চোখ বুজে শুয়ে আছে। "এখানে নেই, এখানে নেই, এগিয়ে চল! ঐ বুঝি পালায়!" আবার সব চুপচাপ।

পর দিন সকালে কাঠ-গুদোমের দরজা খুলেই মা একেবারে থ'! দোরের সামনে এতখানি জায়গা জুড়ে মা-শেয়ালটা মরে পড়ে আছে আর তার কোল ঘেঁষে এতটুকু একটা বাচ্চা জড়েসড়ো হয়ে বসে আছে। দুজনার রং প্রায় সাদা। মায়ের বগলের তলা দিয়ে গলে, বাচ্চাটাকে তুলে বুকে জড়িয়ে কুমু আবার গিয়ে শুল। মা দেখল কি দেখল না বোঝা গেল না।

শেয়াল শিকারের কথা শুনে খবরের কাগজের লোকরা জীপে চড়ে এসেছিল। সাদা শেয়াল শুনে তারা দেখতে এল। কি দুঃখ তাদের! 'আহা! মেরে ফেললেন! সাদা শেয়ালের অনেক দাম! খুব একটা দেখা যায় না। এ জানোয়ার কি মারতে হয় কখনো!' তখন কাকা বলল, 'যিনি এ-কথা বললেন তিনি নাকি পশু-সংরক্ষণের লোক। ওরা নাকি জানোয়ার বাঁচায়, মারে না।' তাই শুনে বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে কুমু বেরিয়ে এল। সবাই তো হাঁ!

সেই লোকটির কোলে বাচ্চাটাকে দিয়ে কুমু বলল, "ওর নাম কুঁকড়ো। ওকে বাঁচাও, মেরো না।" বলে দৌড়ে পালাল।



বন বেড়ালের ছা

দাদুর কাণ্ড দেখে তিন্নি-মুন্নি অবাক। এই রোজ রোজ ওদের বন-জঙ্গলের গল্প বলে, বাপি কেমন বাংলা দেশের বড় যুদ্ধে নিখোঁজ হয়ে তাঁবার মেটেল পেয়েছিল দেখায়, বুড়ি কুসুমদিদিকে বলে, 'ওদের রোজ সকালে ভুট্টা সেদ্ধ করে ছাগলের দুধ আর মধু দিয়ে খেতে দিও। হাড্ডি শক্ত হবে, শরীরে তাগৎ হবে। গরীব-দুঃখীর দিন আসছে, এখন দুবলা হবার সময় নাকি?" আর এখন নেই তো নেই! একটা চিঠি পর্যন্ত নেই!

দাদু হল বাপির দাদু, পঁচানব্বুই বছর বয়স। আজ দু বছর বাতের ব্যথায় পঙ্গু হয়ে তক্তাপোশে শুয়ে শুয়ে খালি খালি ওদের বলে, "মুখ্যু হলে চলবে কেন? অ-আ লিখতে পড়তে শেখ্, নিজের নাম লেখ্, আঁক কষ্, কই পাশালের বইগুলো এনে জোরে জোরে পড়ে শোনা দেখি।"

ওরা দোরগোড়ায় পাশাপাশি বসে সুর করে পড়ে। দাদু বেজায় খুশি হয়ে বলে, "হ্যাঁ, এই ঠিক। আমার দাদু যদি আমাকে লিখতে পড়তে শেখাত তবে কি আমি বনে বনে চৌকিদারি করে দিন কাটাতাম! দেয়ালের গোঁজে তক্তা ফেলে খাট বানিয়ে বুড়ো হাড় জিরোতাম? আমি মুন্সী হতাম, নেয়ারের খাটে ঘুমোতাম,

কেরোসিনের লম্প জেলে রাতে রামায়ণ পড়তাম। কই বাটির নিচে একটু করে দুধ-মাকাই রাখা হল কার জন্য? এক দানা খাবার নষ্ট করতে হয় না, তা জানিস?"

ওরা এ-ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে বলল, "বন থেকে রোজ দুটো বিল্লি-বাচ্চা আসে দাদু, তারা বড্ড রোগা, তাদের দিই।" দাদু কি ভেবে বলল, "তা দিস। কিন্তু তাই বলে বাটি চাটাস না। ওদের দাঁতে বিষ।" শুনে হাসি পেয়েছিল। কি যে বলে দাদু—দাঁতে বিষ। কড়ির মতো সাদা ঝকঝকে দাঁত মুন্নু মিনির, কিন্তু কি ধারালো, বাপ! এক কামড়ে বটের-পাখির ডানা ছিঁড়ে খায়। কিন্তু কোথায় পাবে রোজ রোজ বটের? চকচকে চেকনাই গা হবে, তা না, হাড়গুলো উঁচু উঁচু হয়ে থাকে। তিন্নি মুন্না শালপাতায় করে ওদের দুধ মকাই খেতে দেয়। বড় পাথরের আড়ালে; মুন্নু মিনির বড় ভয়। কুসুমদিদিকে পাক-ঘরের দরজায় একবার দেখেছে কি না দেখেছে, অমনি চোঁ-চোঁ দৌড়। ভারি ভীতু বনের বিল্লি। কিন্তু কি মিষ্টি দেখতে। ঘি রঙের গা, তাতে একটু একটু দাগ, গুর-র করে ডাকে, ওদের কোল বেয়ে উঠে খরখরে জিব দিয়ে গাল চেটে দেয়। তিন্নি মন্না আহ্লাদে গলে যায়। রোজ ওরা খেতে আসে। খাওয়া হলে গড়াগড়ি খেলে। এতটুকু শব্দ শুনলে হাওয়া!

এর মধ্যে দাদু এই কাণ্ড করল। রবিবারের ছুটি, পোস্টমাস্টার মশাই দেখতে এসেছেন। দাদু তিন্নি মুন্নাকে ডেকে পাঠাল। মুন্নু মিনি তখনো খায়নি, কাঠের গাদার পেছনে বাটি লুকিয়ে রেখে আসতে হল। কুসুমদিদি দেখতে পেলে তো ধুয়ে-টুয়ে সারা। ব্যস্, হয়ে গেল মুন্নু মিনির খাওয়া।

দাদু ওদের দেখিয়ে বলল, "মনে থাকে যেন মাস্টার মশাই, এরাই আমার ওয়ারিশ; আর তো কিছু নেই, শুধু ঐ যে আপনি বীমা করিয়েছিলেন ওদের বাপ জন্মাবার সময়, ঐ টাকাটি পাবে আর ওদের বাপের পেনসিলটা পাবে। ওতেই ওরা মানুষ হয়ে যাবে, কি বলেন?

দাদু ব্যস্ত হয়ে মাস্টার মশাইয়ের দিকে তাকাল। মাস্টার মশাই বললেন, "তুমি নিশ্চন্ত থাক, ঠাকুরদা, ওদের নামে লেখাপড়া করে, তোমার টিপ-সই নিয়েছি না। পিওনরা দুজন সাক্ষী আছে। আর তুমিই বা অত বেজার হচ্ছ কেন বল তো? পঁচানব্বুই বছর কাটালে আর দশটা বছর বাঁচবে না? তদ্দিনে তিন্নির গোঁপ বেরুবে।"

শুনে তিন্নি খুশী হয়ে গোঁপের জায়গায় আঙ্গুল বুলিয়ে বলল, "দাদু, তোমার তীর-ধনুকটা আমি নেব কিন্তু। কড়িচাচা যেন হাত না দেয়।"

দাদু মাস্টার মশাইয়ের দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, "ঐ আর এক কথা। আমার ছোট ছেলে দুকড়ি, পাজির পা-ঝাড়া, সে তো জানেনেই ঐ বীমার টাকা হাতাবার জন্য ও কি না করতে পারে। ও কুসুম-মা দুকড়িকে এ-বাড়ির ত্রিসীমানায় আসতে দিবি নে। কুসুম ওদের দেখাশুনা করবে লিখে নিয়েছেন, মাস্টার?"

মাস্টার মশাইয়ের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। "কিচ্ছু ভেবো না ঠাকুরদা, আমি দেখব যেন ওদের কোনো কষ্ট না হয়। তুমি তাড়াতাড়ি সেরে ওঠ।"

তাই শুনে দাদু খুশি হয়ে হাসতে গিয়ে চোখ বুজে কাঠ হয়ে রইল। কুসুমদিদি কেঁদে উঠল। মাস্টার মহাশয়ের সঙ্গে পিওন ছিল। তার নাম হরিদাদা। হরিদাদা হাসপাতালের ডাক্তারকে নিয়ে এল। মাস্টার মশাই বললেন, "ও তিন্নি মুন্না, তোমরা আমার সঙ্গে চল, হরিণছানা এনেছি, পুষব বলে।"

তিন্নি বলল, "কিন্তু—কিন্তু—"

মুন্না ফিসফিস করে বলল, "আমি ওদের খাইয়ে এসেছি। পাক-ঘরের দরজার কাছে এসেছিল, এমনি দুষ্টু!"

সারাদিন ওরা হরিণছানা নিয়ে খেলেছিল। দুপুরে মাস্টার মহাশয়ের বৌ ওদের গাওয়া ঘি দিয়ে কাঁচকলা ভাতে ভাত মেখে খাইয়ে দিয়েছিলেন। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে দেখে দাদু নেই, দাদুর

খাট-বিছানা নেই, খালি কুসুমদিদি একলা গালে হাত দিয়ে বসে আছে। নাকি দাদু স্বর্গে চলে গেছে। দাদুর আক্কেল দেখে ওরা দুজনে অবাক হল! বলা নেই কওয়া নেই অমনি স্বর্গে গেল! আর ঐ ছেঁড়া নোংরা বিছানা বালিশ নিয়ে! এক দিন পরে গেলেই হত, কুসুম কেচে দিত। সে-কথা বলতেই কুসুমদিদি মহা কান্নাকাটি জুড়ে দিল, তাই ওদের থামতে হল।

ক'দিন পাঠশালা যাওয়া বন্ধ রইল। বাড়িতে দূর দূর থেকে কত লোক এল। সবাই বলে দুকড়ি আসেনি? না, দুকড়ি কোথায় কেউ জানে না। বাপের জন্য কোন কালেই বা কি করল সে? দাদুর পেনসিল, বাপির পেনসিল, তাই দিয়ে কোনোমতে চালিয়েছে কুসুম-দিদি। এই প্রথম শুনল তিন্নি মুন্না যে কুসুমদিদি নাকি দাদুর বোনের নাতনী; বনের ধারে ছোট্ট বাড়িটা নাকি তার, নিজের বাপের কাছ থেকে পাওয়া। সবাই বলল, 'এবার টাকার গন্ধ পেয়ে দুকড়ি এসে হাজির হবে দেখো।' কুসুমদিদি বলল, "কাঁচকলাও পাবে না; আসুক না। আমার বাড়িটাও পরে তিন্নি মুন্না পাবে। হুঃ!"

রোজ সকালে মুনু মিনি এসে খেয়ে যেত। দেখতে দেখতে বেশ বড় হয়ে উঠেছিল ওরা। দাঁড়াত যেন তিন্নি মুন্নার কাঁধ অবধি। এত বড় বন-বেড়াল দেখাক তো কেউ! দুধ মকাই না খেলে এমন হত না। গায়ে কেমন দিনে দিনে রঙও ধরেছে। 'কি সুন্দর রে তোরা!' তিন্নি মুন্না ওদের পেটে মাথা ঘষে দিত, ওরা কি জোরে গু-র্-র্, গু-র্-র্ করে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ত। তারপর যেই তিন্নি মুন্না উঠে পড়ত, ওরাও শাঁ করে বনের মধ্যে মিলিয়ে যেত।

কুসুমদিদি বড় ভালো। ওদের খুব যত্ন করত। ওর ভারি ভয় কড়িচাচা না এসে গোলমাল করে। তিন্নি সাহস দিয়ে বলত, "কিচ্ছু ভয় নেই, কুসুমদিদি, আমি দাদুর তীর-ধনুক দিয়ে না, দড়াম করে মুণ্ডু উড়িয়ে দেব।" মুন্না বলল, "সেবার তোমার হাত মুচকে দিয়েছিল, তুমি কেঁদেছিলে। কুসুমদিদি চুন-হলুদ দিয়ে বেঁধে না দিলে, হাতটা

খোঁড়া হয়ে যেত ; দাহু বলেছিল।"

তারপর দুজনে কুসুমদিদিকে বলল, "দাদু কবে ফিরে আসবে? একলা একলা ভালো লাগে না।" সত্যি ভালো লাগত না। ভাগ্যিস মুন্নু মিনি রোজ আসত। আজকাল আবার সন্ধ্যেবেলা আসা ধরেছিল। কুসুমদিদি পাকঘরে চাপাটি করত, ওরা বনের ধারে সব্জি বাগানে জল দিত। ঠিক তখন দেখতে পেত বড় পাথরের পাশ দিয়ে দুটো মিষ্টি হলুদ-পানা মুখ বেরুচ্ছে। কতটুকু আর দুধ-মকাই, গপ্ করে এক গ্রাসে খেয়ে ফেলে, ল্যাজ নেড়ে, গড়াগড়ি করে, ওদের চেটে-চুটে একাকার। যেই না কুসুমদিদি ডাক দিত, "কোথায় গেলি তোরা? রুটি তৈরি।" অমনি দুটোতে হাওয়া হয়ে যেত। যেমনি বড় বন-বেড়াল, তেমনি চালাক।

এমনি করে প্রায় ছয় মাস কেটে গেল। তারপর একদিন যা হবার তাই হল। কড়িচাচা এসে উপস্থিত। এসেই সে কি তার রাগ-মাগ! ওরা দুজনে পাঠশালা থেকে এসে কুসুমদিদির চিঁড়ে কোটায় সাহায্য করছে, এমন সময় দাপাতে দাপাতে এসে উপস্থিত। কোথায় শুনেছে দাদু নাকি মরে গেছে। ওর কথা শুনে তিন্নি মুন্না অবাক। ভয়-ভয়ও করছিল, মানুষ তো নয় যেন একটা ডাকাত। কি সব খারাপ খারাপ কথা কড়িচাচার মুখ দিয়ে বেরুচ্ছিল। কুসুমদিদি কানে হাত দিল। তিন্নি বলল "তুমি বড্ড দুষ্টু। আমি তোমাকে দাদুর তীর-ধনুক দিয়ে মেরে ফেলব।" তাই শুনে চোখ লাল করে কড়িচাচা তিন্নির মাথায় এমনি জোরে গাঁটা মারল যে চামড়া ফেটে চোখে কপালে রক্ত গড়িয়ে পড়ল। একটা চাপা শব্দ করে তিন্নি মুন্না পাক-ঘর দিয়ে পালাল। দুধের কড়া উল্টে ফেলে দিয়ে কড়িচাচা দাপিয়ে বেড়াতে লাগল। "আমাকে বাদ দিয়ে ওদের টাকা দেওয়া, দেখে নেব!"

ওদের পা কাঁপছিল, হাত ঠাণ্ডা হয়ে গেছিল, পেট কামড়াচ্ছিল। সব্জি-বাগানের মাঝখানে দুজনে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে, থর থর করে

কাঁপতে লাগল। ঘরে তখনো কি চ্যাচামেচি। হঠাৎ মুখ তুলে মুন্না বলল, "তাহালে মুন্নু মিনি কি খাবে? ও যে সব দুধ ফেলে দিয়েছে?" তিন্নি উঠে বলল, "গরীব-দুঃখীদের দিন আসছে। দুবলা হলে চলবে না, দাদু বলেছে। কেন, ওদের দুটো করে রুটি দেব। অত বড় বড় দাঁত আছে না, চিবিয়ে খাবে।"

হঠাৎ ঘরের মধ্যে কুসুমদিদি ডুকরে কেঁদে উঠল, দা-হাতে কড়ি-চাচা ঝড়ের মতো ছুটে এল; তিন্নি মুন্না দুহাতে মুখ চেপে ধরে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। পালাবার কথা মনে হল না। তিন্নির কাঁধ ধরে কড়িচাচা তাকে টানতে টানতে বনের দিকে নিয়ে চলল। মুন্নার গলা দিয়ে সে কি করুণ কান্নার মতো একটা শব্দ বেরুল আর সঙ্গে সঙ্গে বড় পাথরের পিছন থেকে সাক্ষাৎ যমদূতের মতো প্রকাণ্ড দুই মূর্তি বেরিয়ে এসে নিমেষের মধ্যে কড়িচাচার মাথায় এক চাঁটি মেরে এক ঝলক আলোর মতো বনের মধ্যে মিলিয়ে গেল। কড়িচাচা পড়ে রইল। কুসুমদিদির চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছিল। উঠি-পড়ি করে কোনোমতে এসে দুজনকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁপতে লাগল। গলা দিয়ে শুধু অদ্ভুত একটা শব্দ বেরুল, "বাঘ! বাঘ!" মুন্না ফিক করে হেসে বলল, "দুৎ! বাঘ কোথায়, ও তো মুন্নু মিনি, আমাদের বন-বেড়াল। ওদের আমরা রোজ দুধ-মকাই খাওয়াই!"

কুসুমদিদি বলল, "আ সব্বনাশ!" বলে মুচ্ছো গেল। ততক্ষণে চ্যাঁচামেচি শুনে গাঁ থেকে অনেক লোকজন এসে গেছিল, ব্যাপার শুনে সবাই হাঁ।

পোস্টমাস্টার বললেন, "নতুন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আগেই বলে-ছিলেন যে সংরক্ষিত বনের একদিকের দেয়াল বড্ড নিচু। সত্যি যদি বাঘ হয়ে থাকে, তবে দেয়াল টপকে এসেছে।"

তিন্নি মুন্না তবু বলতে লাগল, "না, না, আমাদের বন-বেড়াল।"

"কিন্তু বন-বেড়াল কখনো এক চাঁটিতে কারো ঘাড় মটকাতে পারে? কে জানে, পারে হয়তো!"

মুন্নু মিনি আর আসেনি। ঐ দেয়াল নাকি উঁচু করে দেওয়া হয়েছিল। তিন্নি বলল, "ভালোই হল রে মুন্না, ওদের যদি থানায় ধরে নিয়ে যেত!"

একটা সুখের কথা বলতে বাকি ছিল। সেটি হল যে এই ঘটনার কয়েক মাস পরে তিন্নি মুন্নার নিখোঁজ বাবা ফিরে এসেছিল। খুব জখম হয়ে এতদিন সে কোন গাঁয়ের হাসপাতালে পড়েছিল। তারপর গরীব-দুঃখী কজনার দুঃখ কমল।



বাঘ বাঘ

প্রায় একশো বছর আগেকার গল্প, সেই দারজিলিং-এর রেলের লাইন বসাবার সময়কার কথা। জানই তো প্রথম দল গাছপালা কেটে মজবুত করে পথ বেঁধে দিয়ে, এগিয়ে গিয়ে নতুন জায়গায় ক্যাম্প করত আর দু' নম্বর দল এসে পুরনো ক্যাম্পে উঠে, বাঁধা পথে লাইন বসাত।

একবার গাছ কেটে পথ বাঁধানো হয়ে গেছে অথচ দু' নম্বর দল খানিকটা পেছিয়ে পড়ছে, কাজেই প্রথম দল একটু বিশ্রাম করবার সময় পেয়েছিল।

এমন সময় বনের ভিতরকার গাঁ থেকে একদল লোক এসে সাহেবকে বলল, "সাহেব, একটা বাঘের জ্বালায় আমরা টিকতে পারছি না। সেটাকে মেরে দাও।" সাহেব বলল, "কেন, বাঘ কি করে? মানুষ খায়?" "না সাহেব, চিতা-বাঘ কি আর মানুষ খাবে? তবে হাঁস-মুরগি, ছাগল, ভেড়া, বাছুর, কিছু রাখবার জো নেই। বাঘটা মেরে দাও। যত লোক লাগবে আমরা দেব।"

সাহেবও-খেটে খেটে হয়রান হয়েছিল, অমনি রাজী হয়ে গেল। ঠিক হল বন পিটিয়ে বাঘ বের করা হবে। বনের এক ধার থেকে টিন ক্যানেস্তারা, ঢাক, ঢোল, ঘণ্টা, কাঁসি পিটিয়ে কান-ফাটানো শব্দ

করতে করতে এক দল গোল হয়ে এগোতে থাকবে। ভয় পেয়ে বনের সব জানোয়ার সামনের দিকে ছুটবে। বন শেষ হবার আগে বন্দুক নিয়ে শিকারীরা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকবে আর পটাপট জানোয়ার মারিবে। এবার বাঘমশাই না বেরিয়ে পারবে না।

সাহেব তাঁর হিসাব-বাবুকে খুব ভালোবাসতেন, তাকে পাশে নিয়ে বন্দুক হাতে সারা দিন ঝাঁপে খাড়া রইলেন। ওদিকে দু'শো গ্রামবাসী গোটা বন পিটিয়ে শত শত হরিণ, শুয়োর, খরগোশ, বেজি, বহু পাখি ও যাকে বলা যায় নিরামিষ ধরনের জানেয়ার বের করে আনল। তার মধ্যে অনেক মারাও হল। কিন্তু আমিষ ধরনের জানোয়ারের মধ্যে চারটে শেয়াল ছাড়া কিচ্ছু বেরুল না। বাঘ তো নয়ই, বন-বেড়ালও নয়। সবাই অবাক হল, তাহলে বাঘটা গেল কোথায় ?

সন্ধ্যার আগে গাঁয়ের মোড়ল এসে বলল, "আর কেন ? এবার ছাড়ান দিন, সাহেব। ও-বাঘ নিশ্চয় সে-দিন আমাদের কথা শুনে পিট্টান দিয়েছে। ওরা যে মানুষের কথা বোঝে, এর আগেও তার অনেক প্রমাণ পেয়েছি। ওরা রাতারাতি চল্লিশ মাইল দূরে চলে যেতে পারে। গাঁয়ের লোকরা শুয়োর হরিণ খেতে পেয়ে খুশি হয়ে যাবে। আপনার লোকরাও কিছু ভালো মাংস পেলে রাগ করবে না।"

শেষটা সাহেব রাজী হলেন। আর দেরি করা যায় না, কাল থেকে নতুন জায়গায় কাজ শুরু হবে। তখন সাহেব হতাশ হয়ে হিসাব-বাবুকে চাবি দিয়ে বললেন, "তুমি পুরনো ক্যাম্পে ফিরে রাতটা সেখানে থাক। আমরা নতুন ক্যাম্পে যাই। কাল সকালে দু'নম্বর দল এসে পৌঁছলে, তুমি চলে এসো। পুরনো ক্যাম্পে একটা হরিণ পাঠানো হচ্ছে।"

হিসাব-বাবু পুরনো ক্যাম্পে ফিরে হরিণ রান্নার তোড়জোড়ে মেতে গেল। অনেক রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর, নিজের তাঁবুতে ঢুকে, আবছায়াতে দেখে, ওর খাটে কে একজন আরাম করে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। একটু একটু নাক ডাকার শব্দ আসছে। আর ঘরময় সে কি বোটকা

গন্ধ! এদেশের লোকরা তো আর স্নানটান করে না।

রাগের চোটে হিসাব-বাবুর গা জ্বলে গেল। অমনি তাঁবুর বাইরে রাখা বালতি তুলে হু-স্ করে ঠাণ্ডা জল দিয়েছেন ঢেলে ঘুমন্ত লোকটার ওপর! সে লোকটাও আঁৎকে উঠে, 'ঘেঁউক্!' করে বিকট শব্দ করে, তাঁবুর খোলা দরজা দিয়ে দে ছুট! হিসাব-বাবু ভালো করে তাকে দেখতে পেলেন না, শুধু তারার আলোয় চোখে পড়ল হলদের ওপর কালো চকড়া-বকড়া দাগ কাটা এই লম্বা এক ল্যাজ।

হিসাব-বাবু এতক্ষণে টের পেলেন সারাদিন বাঘ কোথায় ছিল! তখন হাঁটু দুটো হঠাৎ নরম হয়ে যাওয়াতে, ধপ করে তিনি পাথরের ওপর বসে পড়লেন। খালাসীরা খানিক বাদে দেখতে পেয়ে ছুটে এসে তাঁর মাথায় জল ঢেলে, তাঁকে অন্য তাঁবুতে তুলল।



বামুনঠাকুরের বাঘ শিকার

যতদূর জানি এই গল্পটা একেবারে সত্যি। জলপাইগুড়ি শহরের নাম কে না জানে? সেখান থেকে বারো মাইল দূরে শিকারপুর বলে একটা গ্রাম আছে। গ্রামের কাছেই অতি চমৎকার এক চা-বাগান।

দেখলে মনে হয় ভারতের উত্তর দিকের পাহাড়-পর্বত থাকে থাকে সাজানো। সবার পিছনে, নীল আকাশের গায়ে রূপোলি রঙে আঁকা বরফের পাহাড়। সেই হল আসল হিমালয়। তার সামনে একটু নিচু নীল পাহাড়ের সারিও তাদের চূড়োগুলি সারা বছর বরফে ঢাকা। তার পরে নীল পাহাড় ক্রমে আরেকটু সবুজ দেখায়, আরেকটু নিচু, আরেকটু স্পষ্ট। তারপরের সারিতে গাছপালার চেহারা বোঝা যায়। দুটো একটা শৌখীন লাল ছাদের বাংলোতে, এখানে ওখানে স্থানীয় লোকদের কুঁড়ে ঘরে রাতে আলো জ্বলতে দেখা যায়।

যতই নিচে নামা যায় বন ততই গভীর হয়। সে-সব বনে নানা রকম জানোয়ারের বাস। বন নেমে আসে একেবারে সমতল জমিতে। ঐ পাহাড়তলীতে অনেক চা-বাগান। পাহাড়ের গা কেটে ধাপে ধাপে বাগিচা। এক চা-বাগান থেকে আরেকটাতে যাবার জন্য সুন্দর রাস্তা আছে। কোথাও বা বনের মধ্যে দিয়ে সে পথ গেছে। তার উপর

দিয়ে চা-বাগানের লোকরা মোটরে জীপে ট্রাকে যাওয়া-আসা করে। তাদের ক্লাব আছে। এর-ওর বাড়ি যাওয়া-আসা আছে। পনেরো কুড়ি মাইল তাদের কাছে কিছুই নয়। শহর থেকে বন্ধু-বান্ধব এলে তো কথাই নেই।

বন-জঙ্গলকে ভয় করলে ওদের চলে না। ওরা সপ্তাহে বার দুই শহরে গিয়ে জিনিসপত্র কেনে, সিনেমা দেখে। বনের মধ্যে ঝিলে দল বেঁধে মাছ ধরে, শিকার করে, চড়িভাতি করে। শহুরে লোকদের থেকে একেবারে অন্যরকম জীবনযাত্রা ওদের।

শিকারের লোভে অনেক বাইরের লোক-ও আসে। পাখি মারা, কি হরিণ শিকার করা তো যে কেউ পারে। ঐ সব বনে তার চেয়ে বড় শিকারও আছে। সেই বড় শিকারের আশায় অনেক সময় বিদেশীরা পর্যন্ত আসত। চা-বাগানের লোকেরা তাই দেখে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল।

পাহাড়ের পায়ের কাছের ঐ সব জঙ্গলে যে বাঘ-ও আছে, সে-কথা সবাই জানত। তারা সবাই মানুষখেকো ছিল না। তবু তারা যথেষ্ট ক্ষতি করত আর অসুবিধাও কিছু কম হত না। শেয়াল, খ্যাঁকশেয়াল এসে রাতে হাঁস-মুরগি নিয়ে যেত। তাতে কারো খুব বেশি ক্ষতি হত না। কিন্তু মাঝে মাঝে তার চেয়ে বড় জানোয়ার এসে ছাগল ভেড়া গরু বাছুর মারত। সেই জন্য বাঘ-শিকারীরা এলে চা-বাগানের লোকরা ভারি খুশি হত।

একবার হল কি, শিকারপুরের কাছে ঐ চা-বাগানে একটা বাঘ বড় উৎপাত করতে আরম্ভ করল। প্রায়ই এর বাড়ি থেকে, ওর বাড়ি থেকে পোষা জানোয়ার রাতারাতি উধাও হতে লাগল। বড় বড় থাবার দাগও দেখা যেত। তখন পর্যন্ত বাঘটা কোনো মানুষকে কিছু বলেনি; তবু লোকেরা একটু ভয় খেল। কারণ যতই দিন যায়, বাঘটার সাহস ততই বাড়ে। এর পর কি করে বসে কে জানে।

ভারি চতুর বাঘ। বাগানের এলাকার মধ্যে রাতে সে ইচ্ছামতো

ঘুরে বেড়াত, কেউ কোনো ভাবে বাধা দিতে পারত না। শেষটা তার আস্পর্ধা এতটা বেড়ে গেল যে একদিন রাতের বেলা ফলের বাগানে একটা বেশ বড় গরু মারল। তখন সকলের টনক নড়ল। এবার একটা কিছু না করলেই নয়।

চা-বাগানের মালিক বড়ই অতিথিবৎসল। বাগান দেখতে অনেক অতিথি এসে, তাঁর আদরযত্ন পেয়ে মুগ্ধ হয়ে ফিরে যেত। বাঘের খবরটা একটু জানাজানি হয়ে গেল। ঐ সময়ে বাগান দেখতে এক অ্যামেরিকান সাহেব এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর বেজায় বাঘ মারার শখ। ভাবলেন, বাঘটাকে যদি মারা যায়, তাহলে তার ছালটি নিয়ে নিউ-ইয়র্কে তাঁর বাড়ির দেয়ালে টাঙাবেন। তারপর বন্ধুবান্ধবদের ডেকে ফলাও করে তাঁর বাঘ-শিকারের গল্প বলবেন। বলা বাহুল্য সঙ্গে সব সরঞ্জাম ছিল, তবে সাহেব আগে কখনো বাঘ তো মারেন-ই নি, ছাড়া অবস্থায় চোখে দেখেননি পর্যন্ত।

এ-সব শুনে মালিক মহা আপত্তি করতে লাগলেন। বাঘটাকে ঘাঁটাবার কি দরকার বাপু! কে জানে, শেষটা যদি কি হতে কি হয়ে যায়! কিন্তু সাহেব নাছোড়বান্দা। কি হতে আবার কি হবে? 'বল্'টার কাছের বড় গাছের উঁচু ডালে আধুনিক মাচা বাঁধা হবে; একজন দক্ষ শিকারী পাশে থাকবে; হাতে থাকবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বাঘমারা বন্দুক। এরমধ্যে আবার বিপদের সম্ভাবনা কোথায় মশাই? ও বাঘটা না মারলে নয়। এমন স্বর্ণ সুযোগ জীবনে দুবার আসে-না।'

শেষ পর্যন্ত মালিক হাল ছেড়ে দিলেন। মাচা বাঁধা হল। দেখে মনে হল এ্যালুমিনিয়ামের তৈরি। শিকারী এল। মাচায় চড়ে, বন্দুক কোলে, সাহেব তার পাশে বসলেন। মরা জানোয়ারটা কিছু দূরে মাটিতে পড়ে। চারদিক অন্ধকার। যে কোনো সময়ে বাঘ এসে খেতে বসবে। তবে ভাবনার কিছু ছিল না। শিকারী সাহেবকে সাবধান করে দিয়েছিল, 'দেখ সাহেব, এতটুকু আওয়াজ

করবে না। সিগারেট খাবে না। একটু শব্দ হল, কি নাকে একটু অন্য রকম গন্ধ গেল, সঙ্গে সঙ্গে বাঘ পালাবে।

শেষ অবধি সত্যি বাঘ এল। চারদিকে ভালো করে দেখে নিয়ে, সে আরাম করে খেতে বসল। শিকারী সাহেবের কোঁকে একটু খোঁচা দিল। এইবার !! বন্দুক রেডি ছিল, কিন্তু সাহেবের বাঁ হাত ছিল তাঁর পকেটে। হাতটা বের করে যেই না বন্দুক তুলতে গেছেন, ব্যস্, আর দেখতে হল না ! প্যান্টের পকেটের সঙ্গে হাতটা একটু ঘষে গেল, অমনি বাঘের দু কান খাড়া আর নিমেষের মধ্যে বাঘ হাওয়া !

আর ও-মুখো হল না সে। সাহেব সারারাত তার আশায় বসে থেকে, রেগেমেগে ভোরের গাড়িতে বিদায় নিলেন।

সাহেবের বাঘ শিকারের গল্প মুখে মুখে ছড়িয়ে গেল। মালিকের বুড়ো বামুন ঠাকুর তাই শুনে চটে কাঁই ! 'এ কি রকম ল্যাদাড়ে সাহেব রে বাপ ! এত ঘটা করেও বাঘটা মারতে পারল না ! এমন আহাম্মুক জন্মে দেখিনি ! আমি হলে......' এই অবধি বলে বামুন-ঠাকুর রান্নাঘরে ফিরে গেল। কাজ তো আর কারো জন্যে পড়ে থাকে না !

সে দিন থেকে ওর মাঝে মাঝেই মনে হত একটা বাঘ মারলে বেশ হয়। বাংলো বাড়ির চারদিকে বন-জঙ্গল। সেখানে জন্তু জানোয়ার কিলবিল করছে। তাই রান্নাঘরের কোণায় সর্বদা একটা পুরনো বন্দুক ঠেকানো থাকত। বন্দুকে গুলিও ভরা থাকত, যদি হঠাৎ দরকার হয়।

এদিকে বাঘটার সাহস অসম্ভব রকম বেড়ে গেল। প্রায় রোজ রাতে সে বাগানে আসা ধরল। সূর্য ডোবার পর লোকে পথে বেরুতে চাইত না। রান্নাঘরের পিছনেই পেয়ারা বাগান। একদিন রাতে বাঘ সেখানে একটা বাছুর মারল। বামুনঠাকুর আর কত সইবে ? এখানকার লোকগুলো সবাই এমনি আনাড়ি যে ও বাঘ মারা তাদের কম্ম নয়। ওকেই হাত লাগাতে হবে। রাতে বাঘটা নিশ্চয় আবার

ভোজ খেতে আসবে। বেশ, তখন দেখা যাবে।

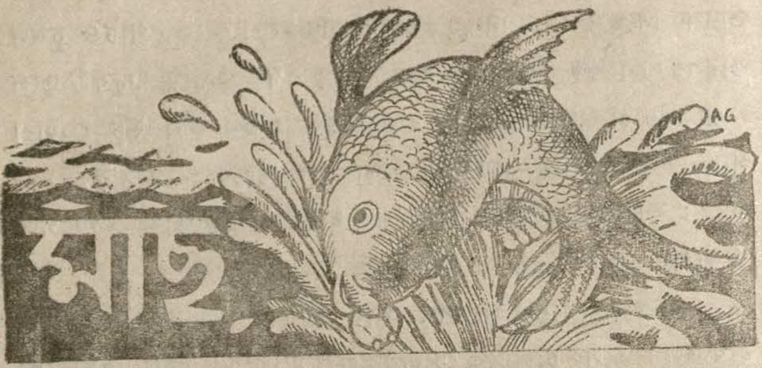
সেদিন বামুনঠাকুর তাড়াতাড়ি রান্না সেরে, সবাইকে খাইয়ে দিল। তারপর নিজেও খেয়ে নিল। সেদিনকার মতো কাজের পাটও চুকল তারপর কাউকে কিছু না বলে, গায়ে কম্বল জড়িয়ে, বন্দুকটি তুলে নিয়ে পেয়ারা-বাগানে গেল। বাছুরটার কাছেই একটা উঁচু পেয়ারা গাছ ছিল। গাছতলায় চটিজোড়া খুলে রেখে, বামুনঠাকুর মগ-ডালের কাছাকাছি চড়ে বসে রইল। মাচানের সঙ্গে তার কি? গাছ থাকলেই হল।

অনেকক্ষণ বসে রইল সে; প্রায় ঘুমিয়েই পড়েছিল, এমন সময় বাঘ এল। এসেই চারদিকে চেয়ে, নিশ্চিন্ত মনে খেতে বসল। মানুষের গন্ধটন্ধতেও বাঘ অভ্যস্ত।

এই হল সময়! বামুনঠাকুর শুনেছিল যে একবার খাওয়া শুরু করলে বাঘের কোনো দিকে খেয়াল থাকে না। বন্দুক তুলতে যাবে, ঠিক সেই সময় কাশি এল। এ তার বারোমেসে কাশি, ওষুধ খেলেও যায় না। খক্-খক্-খক্ করে খুব খানিকটা কাশতে হল। এই রে! সব বুঝি পণ্ড হল! বাঘ এক্ষুনি অদৃশ্য হবে! কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কাশির শব্দ শুনে বাঘটা কান খাড়া করে দু সেকেণ্ড অপেক্ষা করল। তারপর আবার খেতে লাগল। ও কাশি তো তার অচেনা নয়। এদিকে এলেই শুনতে পায়। ওতে ভয়ের কিছু নেই।

কাশি থামতেই, বন্দুক তুলে এক গুলিতে বামুন ঠাকুর বাঘটাকে মেরে ফেলল। বাঘটা লাফিয়ে উঠে, গড়িয়ে পড়ল।

আর কি বামুনঠাকুর সেখানে থাকে! খচমচ করে গাছ থেকে নেমে চটি পায়ে দিয়ে রান্নাঘরের দিকে দৌড়ল! এ তো কুঁড়েমি করার সময় নয়। অনেক কাজ রয়েছে যে। বাঘের গা থেকে ছালটা খুলে রান্নাঘরের দেয়ালে টাঙিয়ে, বন্ধুবান্ধবদের ডেকে বলতে হবে তো কেমন করে বাঘ মারা হয়েছিল!



কলকাতার মতো নয় এ জায়গাটা। এখানে সবাই মাছ ধরে। আর কি সব জায়গা মাছ ধরার! বিশাল বিশাল দীঘি, এপার ওপার ভালো করে দেখা যায় না। কম করে দেড়শো দুশো বছরের পুরনো। ছোড়দাদু বলেন ওর জল ছেঁচে ফেলে দিলে নাকি সেকাল বেরিয়ে পড়বে। বাতাস দিলে ঢেউ ওঠে। নৌকো ডুবে যেতে পারে। ঠাকুর ভাসান হয়।

অনেকেই ঐ সব পুকুরে স্নান করে, কাপড় কাচে, বাসন ধোয়, সাঁতার কাটে। খাবার জল নেওয়া বারণ, তার জন্য ইঁদারা আছে। পুকুরগুলোর মাঝখানটা কত গভীর কে জানে। পাড়ের কাছে এন্তার শামুক, গুগলী। বুড়োরা কেউ কেউ হাঁপানির জন্য গুগলী খান। ছোড়দাদুও খান।

খুব পুরনো বাঁধানো ঘাটে ফাটল ধরে গেছে। ধাপগুলো জলের নিচে অনেক দূর নেমে গেছে। এ বছর বেশি বৃষ্টি হয়নি, তাই জল নাকি কমে গেছে। তবু আমাদের মনে হল এখনো যথেষ্ট আছে। এখনো পুকুরে ছোটখাটো একটা তিমি ডুবিয়ে রাখা যায়। মাছ তো আছেই, মেলা মাছ। মাঝ পুকুরে ঘাই দিয়ে ওঠে, মানুষের মাথার চেয়ে বড় মাথা; রুই কাতলা কালবাউস মিরগেল। কে জানে কি

সবাই ধরে। কেউ মাছ কেনে না, বরং অন্য জায়গায় বিক্রি করে গ্রামের মধ্যে আর আশেপাশে ঐ রকম পাঁচ-সাতটা দীঘি। ছোড়দাদু বলেন এটা মাছ ধরার স্বর্গ। সকলের হাতে ছিপ দেখা যায়।

ওখানে ছোড়দাদুর বাড়িতে সমস্ত পুজোর ছুটি কাটবে, মাছ ধরাটা রপ্ত করতে হবে। এরই মধ্যে একদিন মহা হৈ-চৈ। চান করতে গিয়ে বড় জ্যাঠাইমার হাত থেকে বারো ভরি ওজনের সাবেকি সোনার বালা কেমন করে খসে জলে ডুবে গেছে! তখুনি টের পেয়েছিলেন, কলসি ভাসিয়ে ঠিক ঐ জায়গাটিতে অপেক্ষা করে ছিলেন। সাঁতারে এরা কেউ কম পটু নয়।

তখুনি হাঁকডাক করে পরাণ জেলেকে ধরে আনা হল। সে নাকি সমুদ্রে ডুবুরির কাজ করত। একবার শুধু বলল, "এনে দিলে পাঁচ টাকা মাঠান, না আনলে কিচ্ছু না।" এই বলে বুক ভরে নিশ্বাস নিয়ে এক ডুব। ডুব তো ডুব। আমরা সবাই নিশ্বাস বন্ধ করে বসে রইলাম।

ছোড়দাদু পাড়ে দাঁড়িয়ে এক দুই তিন চার গুনতে লাগলেন। সত্তর অবধি পৌঁছেছেন অমনি ভুস্ করে পরাণ জেলে ভেসে উঠল, হাতে তার বড় জ্যাঠাইমার বালা। কনুই থেকে রক্ত পড়ছে। বালা ছাড়া আরেকটা জিনিসও তুলেছিল, ছোট্ট একটা শীলমোহর করা পেতলের ঘড়া। ঝাঁকালে ঝনঝন করে। খুলে দেখা গেল ভেতরে কালো হয়ে যাওয়া বড় বড় পয়সা। ছোড়দাদু বললেন, "কার মানত-করা পয়সা কে জানে। বন্ধ করে আবার ফেলে দে। বললাম না জল ছেঁচলে ইতিহাস উঠবে।"

কিন্তু পরাণ জেলের কনুইতে রক্ত কেন? পারণ বলল, "নোলক-পরা মাছ-মেয়ে কামড়ে দিয়েছে।"

সবার চক্ষু চড়কগাছ। বলে কি পরাণ!

ছোড়দাদু বললেন, "ওরে, অনেকক্ষণ নিশ্বাস বন্ধ করে থেকে নিশ্চয় ভুল দেখেছিস।"

পরাণ কাষ্ঠ হেসে কনুইতে ছোট ছোট দাঁতের দাগ দেখাল। কারো মুখে কথা নেই। পরাণ বলল, "ডুবুরির কাজ করি, বাবু, জলের নিচে চেয়ে দেখি। স্পষ্ট দেখলাম বড়বড় চোখ, ঠোঁটের ওপর ছুটি মুক্তো ঝুলছে। আমি কি নোলক চিনি না?"

ছোড়দাছু গম্ভীর মুখে চলে গেলেন।

তারপর যে যার বাড়ি চলে গেল। পরাণকে পাঁচ টাকা আর সন্দেশ দেওয়া হল। সেই ইস্তক আমাদের দলের সকলের মাছ ধরার শখ দ্বিগুণ বেড়ে গেল। অন্যদের পরামর্শমতো আমিও সরু বেতের আগায় বঁড়শী বেঁধে একটা ছিপ বানিয়ে ফেললাম। যদি কোনো রকমে মাছ-মেয়েটাকে ধরা যায়, তাহলে তাকে নিয়ে আমরা দেশে দেশে দেখিয়ে বেড়াব। দেশও দেখা হবে, আবার হাজার হাজার টাকাও পাওয়া যাবে। তাহলে ক্লাবের জন্য নতুন ফুটবল কেনার কোনোই অসুবিধা হবে না।

এইভাবে ওখানকার করোনেশন ফুটবল ক্লাবের একটা মাছ-ধরা বিভাগের পত্তন হল। ত্রিশজন মেম্বর ত্রিশটা নতুন ছিপ তৈরি করল। তার একটাতে না একটাতে কি মাছ-মেয়ে ধরা পড়বে না? পরাণই তো তখন ওকে বগলদাবাই করে তুলে আনতে পারত। না হয় আরেকটু কামড়াত, কি এমন হত তাতে?

ভোলা বলল, "না রে, এই ভাল। পরাণ ওকে সের দরে বেচে দিত, আমাদের দিত না। পয়সাকড়িও নেই যে কিনে নেব।

তপা বলল, "সে না হয় হল। ধরে তারপর তাকে কোথায় রাখা হবে?"

নবু চৌধুরী বলল, "আমাদের বুড়োদাছুর স্নানের ঘরে টাইল বাঁধানো চৌবাচ্চা আছে, তাতে রাখা যায়। কেউ ও-ঘরে যায় না, নাকি বুড়োদাছুকে মাঝে মাঝে দেখা যায়। সব অবিশ্যি বাজে কথা। আমি ওখানে মাছ ধরার সরঞ্জাম রাখি।"

"বেশ, ভালো কথা। কিন্তু কি খাওয়ানো হবে? কি খায় ওরা?"

"কেন, যা দিয়ে ধরা হবে, তাই খাওয়ানো হবে। ভালো না লাগলে টোপ গিলবে কেন? তখনি বোঝা যাবে কি খায়।"

বটু বলল, তাহলে একেকটা ছিপে একেক রকম টোপ দেওয়া হোক। আমি কেঁচো দেব, বাবা দেয়।"

ঘনা বলল, "মাছ-মেয়ে কখনো কেঁচো খায়? আমি পিঁপড়ের ডিম দেব। কোথায় পাওয়া যায় আমি জানি।"

বাবু বলল, "এ রাম! চার ফেললে কেমন হয়?"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "চার আবার কি?"

"ওমা, চার জানিস না? মশলামাখা একরকম জিনিস। তার গন্ধে ছোঁক ছোঁক করে মাছরা সব ভেসে ওঠে। তখন ধর আর টপাটপ চুবড়িতে ফেল।"

ফটিক বলল, "ছিঃ ওভাবে লোভ দেখিয়ে মাছ-মেয়ে ধরাটা ঠিক হবে না।"

তপা বলল, "হাওয়া অফিসের কালো সাহেবরা রঙিন পালকের নকল ফড়িং বেঁধে টোপ ঝোলায়। সত্যি ভেবে মাছ যেই না কপ্ করে অমনি টপ করে বঁড়শী বেঁধে!"

জম্বু বলল, "উঃ! কি নিষ্ঠুর! ও-সব চলবে না।"

ঘন্টু বলল, "তাহলে জাল ফেলে ধর।"

শম্ভু বলল, "এ পুকুরে ছোড়দাদু জাল ফেলতে দেবে না।"

তারপর অনেকক্ষণ সবাই চুপ করে ভাবতে লাগল। কি করা যায়? এত গভীর জলে পোলো বসানো চলবে না। ফুটো হাঁড়ি ডোবানো যায়, ঝাঁঝরি নৌকা ডোবানো যায়, কিন্তু মাছ-মেয়ে কখনই তাতে ধরা দেবে না।

ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এল। এমন সময় উঠি-পড়ি করে জগা ছুটে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "ওরে, ওরা লম্প জেলে রায়দের দীঘিতে মাছ ধরছে।

"কারা তারা?"

"হাওয়া অফিসের কালো সাহেবরা।"

"কি রকম? কি রকম?"

বাঁশের ডগায় লম্প জ্বেলে ঝুলিয়ে রাখছে। জলে তার ছায়া পড়ছে। তাই দেখতে কাতারে কাতারে মাছ ভাসছে। নাকি ইচ্ছে হলে ঘাটে দাঁড়িয়ে কোলপাঁজা করে তোলা যায়।"

শুনে প্রথমটা সবাই রেগে গেল। ইস্ কি খারাপ! আলো দেখিয়ে ভুলিয়ে আনা! ছিঃ!

পরে মনে হল এই তো সবচেয়ে ভালো উপায়। আলো দেখতে মাছ মেয়ে আসবে। তখন ঘাটে দাঁড়িয়ে তাকে কোলপাঁজা করে তুলে ফেললেই হল। বঁড়শী বিধবে না, রক্ত পড়বে না, ব্যথা লাগবে না, কেঁচো কি পিঁপড়ের ডিম কি বিশ্রী কিছু খেতে হবে না। সবাই হাসি-মুখে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। বাড়ি যাবার পথে, একবার রায়দের দীঘি ঘুরে, কি ভাবে কি করতে হয় দেখে আসা হল।

সেদিন অনেক রাতে যারা বাড়ি থেকে বেরুতে পারল, তারা বাঁশের আগায় পিসিমার লম্পটা জ্বেলে জলের ওপর ঝুলিয়ে দিয়ে, চুপ করে বসে রইল। জলের ওপর লম্পটার ছায়া দুলতে লাগল, এরা রইল ছায়াতে। অনেক পরে জলের মধ্যে একটা নড়াচড়া দেখা গেল। সত্যি সত্যি কাতারে কাতারে মাছ এল আলো দেখতে! এদের মুখে কথা সরে না। তারপর হঠাৎ জম্বু আমার কাঁধ খামচে ধরল, ফোঁস ফোঁস করে দু-তিন জন নিশ্বাস ছাড়ল। বড় একটা কালো মাথা জলের ওপর ভেসে উঠেছে! লম্পর আলোতে দেখা গেল, তার ঠোঁটের ওপর সোনার রিং-এ গাঁথা দুটো মুক্তো ঝুলছে!

সঙ্গে সঙ্গে ছোড়দাদু চাপা গলায় বললেন, "জলঙ্গি! তুই তা হলে এখনো বেঁচে আছিস! তুই আমি ছাড়া আর কেউ নেই রে!"

কালো মাথা তুলে প্রকাণ্ড কাতলা মাছটা বড় বড় চোখ দিয়ে ছোড়দাদুর চোখের দিকে একবার চাইল। তারপর একলাফে তিন হাত শূন্যে উঠে ল্যাজের এক ঝাপটা দিয়ে, ভু—স্ করে আবার ডুবে

গেল।

ছোড়দাদু বললেন, "আমার দাদা ওকে পুষেছিল, ডাকলেই আসত। বৌদিদি ওর নাকে নিজের নোলক পরিয়ে দিয়েছিল। দাদা মারা যাওয়ার পর ওকে আর দেখিনি।"

"কবে, ছোড়দাদু, কবে?"

"তা বছর পঞ্চাশ তো হবেই।" ছোড়দাদু হোঁচট খেতে খেতে ঘরে গেলেন।

আমরা মাছধরা ছেড়ে দিয়েছি। আজকাল বেজি পুষি।

মাছের কথা



আমরা যাকে বাইন মাছ বলি, ইউরোপ আমেরিকার ঈল মাছও প্রায় তাই। সাপের মতো সরু লম্বা গোল গা, কিন্তু মাছের মতো মাথা, কানকো, ডানি। বিলেতের ঈল মাছগুলোর গায়ে কিছু আঁশও আছে বলে শোনা যায়। ওসব দেশে যাঁরা জীবতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করেন, তাঁরা ঈল মাছের বিষয় নানান্ বিস্ময়কর তথ্য আবিষ্কার করেছেন।

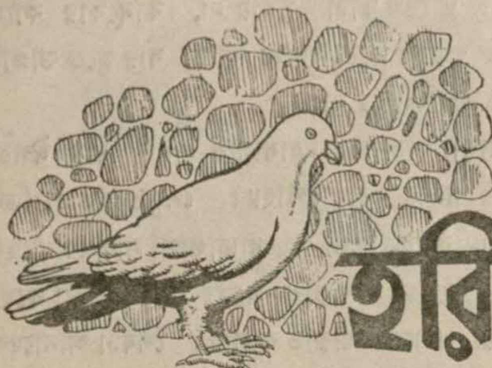
সাধারণতঃ ইংলণ্ডে আমেরিকায় পুকুরে, নদীতে ও সমুদ্রের তীরের কাছাকাছি ঈল মাছ দেখা যায়। লোকে ঈল মাছ ধরে খায়, স্বাদটা বেশ ভালোই। অবশ্যি নানা রকম ঈল মাছ আছে, কোনো কোনোটা খুব বিষাক্ত বলেও শোনা যায়। বড় বড় ঈল মাছগুলো দু হাত পর্যন্ত লম্বা হয়।

আশ্চর্যের বিষয় হল এই যে যদিও ইংলণ্ড আমেরিকার খালে বিলে হরদম ঈল মাছ দেখা যায়, ওসব দেশে তারা কখনো ডিম পাড়ে না, বাচ্চা তোলে না। ডিম পাড়তে দলে দলে ঈল মাছরা অতলান্ত মহাসাগরের বার্মুডা দ্বীপের ধারের গভীর সাগরে যাত্রা করে। প্রাণীতত্ত্ববিদরা অবাক্ হয়ে লক্ষ্য করেছেন যে শীত পড়বার ঠিক আগে দলে দলে বয়স্ক, ঈল মাছরা ইংলণ্ড, আইস্ল্যাণ্ড, আমেরিকা ইত্যাদি দেশের পুকুর খাল বিল থেকে বেরিয়ে বড় নদী ধরে সমুদ্রে পৌঁছয়।

নদীতে পৌঁছবার আগে কত সময় মাছগুলোকে অনেকখানি পথ ডাঙার ওপর দিয়ে যেতে হয়। তাতেও তারা ভড়কায় না, কান্‌কোর কাছে জল ধরে রাখবার জন্য স্পঞ্জের মতো ব্যবস্থা আছে, যার জন্যে ডাঙায় চলতে তাদের কোনো অসুবিধা হয় না।

সমুদ্রে পড়ে সোজা অতলান্ত মহাসাগরে পাড়ি দিয়ে ঈলরা বার্মুডা দ্বীপের ধারে গভীর জলে পৌঁছয়। সেখানে তারা ডিম পাড়ে, বাচ্চা তোলে। কাঁচের মতো স্বচ্ছ বাচ্চাগুলো সাধারণ মাছের মতো দেখতে হয়। কয়েক মাস তারা জলের নিচেই খেলা করে, আস্তে আস্তে বড় হয়, শরীরের আকৃতি বদলায়। শেষটা আমাদের চেনা ঈল মাছের রূপ নিয়ে তারা ওপরে ভেসে ওঠে। তারপর দলে দলে আবার যে যার বাড়ির দিকে রওনা হয়।

এই ব্যাপারটা সব চাইতে বিস্ময়কর। বুড়ো মাছরা ডিম দিয়ে মরে যায় আর বাড়ি ফেরে না; তবু তাদের ছানারা হাজার হাজার মাইল সমুদ্র পার হয়ে, যে যার নিজের দেশের পথ চিনে নেয়। আমেরিকার ইংলণ্ডের, আইসল্যাণ্ডের ঈলদের চেহারার তফাত আছে, তাই দেখে বোঝা যায় যে ভুলেও তারা কখনো আমেরিকা যেতে ইংলণ্ড কিংবা আইসল্যাণ্ডে গিয়ে হাজির হয় না। ঈল মাছদের বার্মুডা যাত্রা যাযাবর পাখিদের যাত্রার চেয়েও আরো অদ্ভুত। কারণ বার্মুডা থেকে সাঁতরে ইংলণ্ডে পৌঁছতে মাছগুলোর দু বছর সময় লাগে, বাপ-মারাও সঙ্গে থাকে না যে পথ বাৎলে দেবে, তবু ঠিক যে যার নিজের বাড়িতে ফিরে আসে। তারপর বয়স হলে এই মাছেরাই আবার তাদের জন্মস্থান বর্মুডাতে গিয়ে ডিম পেড়ে, বাচ্চা তুলে, নিজেরা মারা যায়। প্রকৃতির খাতায় কত আশ্চর্য কাহিনী লেখা আছে তার হিসাব নেই।



হরিয়াল

যদিও টেরেন চেপেছে, আসলে কিছু জুতো সাফের কাজ জানে না পটো। তবে ঐ মিনি-পয়সায় রেল চাপা যায় আর কিছু না হোক, চল্লিশ-পঞ্চাশ পয়সা তো লাভ হয়। তার অর্ধেক অবিশ্যি বর্মী নিয়ে নেয়, তবু যা বাকি থাকে তাই দিয়েই তেল নুন শুকনো লংকাটা শাকটা কিনে ঠামাকে দিতে পারে। ঠামা তিন বাড়িতে বাসন মেজে চাল আর আটা কেনে। তাতেই ওদের চলে যায়। থাকে একটা ঝোপড়ামতোতে। তবে সব সময় খিদে, সব সময় খিদে। পথের ধারের গাছ-গাছড়া থেকে যা পাওয়া যায়, পেড়ে খেতে হয়।—এই রে! দুটো সায়েব উঠল।

লাল সায়েব দেখেনি পটো। এ লাইনে তারা আসে না। এই কালো সায়েবরাও কিচ্ছু কম যায় না। কেমন প্যাণ্টেলুন পরা, চকচকে জুতো পায়ে। ভেতরে যাবার সুড়ঙ্গের মুখে দাঁড়িয়ে একটা সায়েব রেলের চা-ওয়ালাকে বলল, "ফাস্ট ক্লাস গাড়িতে আবার এরা কেন?"

চা-ওলা বলল, "জুতো সাফ করে সায়েব। অনেকে চান। ভালো ছেলে। আর ও বুড়োটা চোখে দেখে না। বর্ধমানে নেবে যাবে।" সায়েবদের সঙ্গে বন্দুক ছিল। দুটো লোক-ও ছিল, খাকি

কুর্তা প্যান্টেলুন পরা। একজন কতকগুলো সোঁদর সোঁদর থলি, ব্যাগ্ নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। অন্য লোকেটা এক গাদা মরা পাখি পটোর সামনে ফেলল। পটো শিউরে উঠল।

মরা হাঁস, বুনো পায়রা, হরিয়াল।

হরিয়াল! কি সুন্দর দেখতে! আহা, ওকে কি বলে মারল! ঠিক সবুজ রঙের পায়রার মতো—ইস্! পাখিটা চোখ মেলে একবার হাঁ করল। গাঢ় রঙের চোখ, সে ঘোর লাল, না ঘোর নীল, তা বোঝা যায় না। মরেনি। বোধ হয় জল-তেষ্টা পেয়েছে। চোখের মধ্যে কি কষ্ট. কি কষ্ট!

পটো লোকটার দিকে চেয়ে বলল, "ওর তেষ্টা পেয়েছে। একটু জল দিলে ভালো হয়।" লোকটা বিশ্রী করে হাসল।

"তোর দেখছি দোয়ার শরীল! ওগুলো কি হবে জানিস্? বর্ধমানের কাছে মিলিংটারি তাঁবু আছে, সেখানে নে গিয়ে, দু-দিন দড়িতে টাঙিয়ে রাখবে। মাংস নরম দেবে। তাপ্পর নামিয়ে নে, পালক ছাড়িয়ে মশলা মাখিয়ে শিকে বিঁধিয়ে কাঠ-কয়লার আগুনে ঝল্সাবে। তখন তার যা খোস্‌বাই ছাড়বে, সে নাকে গেলেও ভাববি বুঝি সগ্‌গে গেছিস্! সবগুলোর সমান তার হবে। কোনটা হরা-রঙের, কোনটা কেলে-কুচ্ছিৎ কিচ্ছু মালুম দেবে না। নে, সরে বোস্। হাত লাগাস্ না; সব গুনিগোন্‌তা অছে। আমরা পাশের কামরায় যাচ্ছি, যদি কিছু নষ্টামি করিস্ তো আস্ত রাখব না।"

পটোর গা গুলোচ্ছিল। সে আরেকটু সরে বসল। বুড়ো চাকরটার দিকে তাকিয়ে ছিল। ওর চোখ আগুনের মতো জ্বলছিল। "হরিয়ালটা তে জিন্দা আছে। গায়ের পাশ দিয়ে গুলি লেগে বেরিয়ে গেছে দেখছি। বেশি জখম হয় নি। খালি তাড়্স লেগেছে।"

চাকরটা দরজা দিয়ে নামতে নামতে বলল, "ও বাবা! মড়াটাও যে কথা বলে! দড়িতে দুদিন ঝুলে থাকলে, ও জিন্দা আর মুর্দাতে কোনো ফারাক থাকে না, বুঝলে!" এই বলে দরজার হাতল ধরে

ঝুলে নেমে পড়ল। অন্য লোকটাও ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে নেমে গেল। ঠিক সেই সময় গাড়িও ছেড়ে দিল।

যেই না গাড়ি ছাড়ল, পটো উঠে পড়ল, বুড়ো বলল, "কোথায় যাও, বাপ?" "ওকে একটু জল দিই।" "আমার বদনায় খাবার জল আছে, তাই দাও।"

তাই দিল পটো। পাখিটা হাঁ করে ফোঁটা ফোঁটা অনেকখানি জল খেল। তারপর ডানা ঝাপটাবার চেষ্টা করল। বুড়ো বলল, "রও!" এই বলে, ফতুয়ার পকেট থেকে বাঁকামতো একটা ছোরা বের করে, পাখিটার পায়ের বাঁধন কেটে দিল। দু' হাতে পাখিটাকে ধরে তাকে পায়ের ওপর দাঁড় করাবার চেষ্টা করল পটো। পাখি এলিয়ে পড়ল। পটোর কান্না পেল। তবে বোধ হয় বাঁচবে না। গুলি খেয়ে কেউ বাঁচে?

বুড়ো ওর মনের কথা টের পেয়ে বলল, "নিশ্চয় বাঁচবে। গুলি ওর গায়ে বেঁধেনি। এতক্ষণ বাঁধা ছিল, তাই পায়ে খিল ধরে গেছে। খায়ওনি নিশ্চয় অনেকক্ষণ।" চাদরের মধ্যে থেকে দুটো ময়দার গুলির মতো কি যেন বের করে পাখির সামনে ধরতেই, সেগুলোকে ঠুকরে খেয়ে নিল হরিয়াল। বুড়ো তখন দু' হাতে আলগোছে ধরে, নিজের জামার বুকের মধ্যে গুঁজে রেখে পটোকে বলল, "সামনের গুমটিতে গাড়ি আস্তে করবে, সেখানে আমাদের নামতে হবে। নইলে গোনা-গুন্তির পাখি নিয়ে সোরগোল তুললেই মুশকিল।"

এই বলে থলিটা তুলে নিয়ে, গাড়ির বেগ একটু কমতেই বুড়ো টুপ করে নেমে গেল। পটোও নামল। পথ বলে কিছু ছিল না ওখানে। নিতান্ত আঘাটা। বুড়ো তাড়াতাড়ি গাছ-গাছলার আড়ালে গিয়ে ওকে ডাকতে লাগল। "চল, চল, পাখিটার গায়ে একটু ওষুধ করতে হবে। যাতে না পাকে।"

বনের মধ্যে একটা মাটির ঢিপিতে বসে বুড়ো খুদে একটা কৌটো

থেকে হলুদ রঙের ওষুধ বের করে, পাখির ব্যথার জায়গায় আস্তে আস্তে লাগিয়ে দিল। পাখি একটু ধড়ফড় করে উঠল, একবার ডানা ঝাপটাল। তখন খুব যত্ন করে পটোর হাতে পাখি দিয়ে বুড়ো বলল, "ওকে আমি তোমাকে দিলাম। আর কিছু হবে না ওর।"

পটো বলল, "উড়তে পারবে?" নিশ্চয় পারবে। আমরা জাত পাখিওলা। পাখি দেখেই পাখি চিনি। মানুষ-ও।"

পটো উঠে দাঁড়াল। "আমি পাখি চাই না।"

তারপর পাখিসুদ্ধ দুই হাত মাথার ওপর তুলে, ছোট একটা ঝাঁকি দিয়ে, বুড়ো হাতের মুঠি খুলে দিল। পাখিটা একবার ডানা ঝাপটে, মাথার ওপর এক পাক ঘুরে, শাঁ করে উড়ে গেল।

তখন বুড়ো পটোর চোখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল, "স্টেশন থেকে তুমি আমার পিছু নিয়েছ কেন?" পটো পা দিয়ে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে বলল, "তোমার ডান হাতে যে ছটা আঙুল! ইস্টিশনে তোমার ছবি টেঙিয়েছে, চেনা যায় না। এই দাড়ি-গোঁপ, ডাকাতের মতো দেখতে। আর ডান হাতে ছ-টা আঙুল। বলেছে তুমি নাকি চাল-চোরাদের পাণ্ডা। তোমার নাম ওস্তাদ। তোমাকে ধরিয়ে দিলে দু' শো টাকা দেবেক্। তুমি এখান থেকে অনেক দূরে চলে যাও। নইলে কে ধরিয়ে দেবে।"

"তুমি কেন দিচ্ছ না? বেশ দুশো টাকা পাবে।" পটো বলল, "তুমি কেন পাখি উড়িয়ে দিলে?"

বুড়ো হেসে বলল, "এবার দাও দিকিনি আমার জুতোটা সাফ করে।" এই বলে জঘন্য নোংরা ঠ্যাং দুটো, তার চেয়েও জঘন্য ছেঁড়া চটিসুদ্ধ এগিয়ে দিল।

চটি চলনসই গোছের সাফ হলে, বুড়ো পটোকে পাঁচটা টাকা দিয়ে বলল, "খুব ভালো কাজ হয়েছে। এটা রেলের রোজগার নয়। এর অর্ধেক বর্মীকে দিতে হবে না। তাছাড়া বর্মী এখন হাজতে।"

এই বলে উঠে পড়ে বলল, "এবং আমিও ওস্তাদ নই। যদিও আমার ছ-টা আঙুল। আঙুলটা অবিশ্যি সত্যি নয়।" বলে পড় পড় করে খুলে ফেলল আঙুলটা। পটোর থুত্‌নি ঝুলে পড়ল।

বুড়ো বলল, "আমি সরকারী টিকটিকি। আমাদের বাগানে কাজ করবার লোক দরকার। গুদোম আছে। ঠামার সঙ্গে থাকতে পারবে। চল।"



পাখির গল্প

ডান পাটা মাটি থেকে এক বিঘৎ ওঠে, তার বেশি ওঠে না। ঝুমু তা হলে চলে কি করে?

মাসিরা মাকে বললেন—'কিচ্ছু ভাবিসনে দিদি, রোগ তো সেরেই গেছে, এখন ওকে ঝাড়া তিন মাস সোনাঝুরিতে মা-র কাছে রেখে দে, দেখিস কেমন চাঙ্গা হয়ে উঠবে।'

বাবাও তাই বললেন—'বাঃ, তবে আর ভাবনা কি, কুমু? তা ছাড়া ওখানে ঐ লাটু বলে মজার ছেলেটা আছে, হেসে খেলে তোর দিন কেটে যাবে।'

কিন্তু পড়া। কুমু যে পড়ায় বড় ভালো ছিল। তা তিন মাস শুয়ে শুয়ে, তিন মাস গেছে পায়ে লোহার ফ্রেম বেঁধে হাঁটতে শিখে। আরো তিন মাস যদি যায় দিদিমার বাড়িতে তবে পড়া সব ভুলে যাবে না?

মা বললেম—'আবার পড়ার জন্য অত ভাবনা কিসের, বোকা মেয়ে। লেখাপড়া চিরকালের জিনিস, ওকি কেউ ভোলে নাকি? আমি তো লেখাপড়া ছেড়েছি আজ পনেরো বছর, তবু সব ভুলে গেছি নাকি?,

'কিন্তু—কিন্তু—'কুমুর চোখে জল আসে। মাসিরা যান রেগে।

'ও আবার কি। বুড়ো ধাড়ি আট বছরের মেয়ের আবার কথায় কথায় কান্না কি? সোনাঝুরি পাহাড়ে দেশ, লোকে বলে পরীদের বাস, কতবার বলেছি না তোকে? তারপর এই সময় সেখানে গাছে গাছে নাসপাতি পাকে, গাছের ডাল ফলের ভারে নুয়ে এসে প্রায় মাটি ছোঁয়। ওখানে যাবার জন্য লোকে তপস্যা করে, তোর আবার চোখে জল কিসের? সবেতে দেখছি তোর বাড়াবাড়ি!'

মা বললেন—'সত্যি পড়ার জন্য অত ভাবনা কিসের মা? লাটুর বাড়ির মাস্টার তোমাকেও পড়াবেন। এই তিন মাস ভালো করে পড়ো, তোমাদের ইস্কুলের বড় দিদিমণিকে বললে হয়তো পরীক্ষা করে ওপরের ক্লাসে নিতেও পারেন।'

মাসিরা বললেন—'ন্যাকা! বেঁচে উঠেছিস্ এই যথেষ্ট, তা না হয় একটা বছর ক্ষতিই হল, তাতে কি এমন অসুবিধেটা হবে শুনি?'

মেজমাসি বললেন—'আরে, বাবা তো আমাদের হেডমিস্ট্রেসের সঙ্গে ঝগড়া করে, আমাদের তিন বোনকেই ইস্কুল ছাড়িয়ে একটি বছর বাড়িতে বসিয়ে রেখেছিলেন, তা আমরা কেঁদে ভাসিয়ে ছিলাম নাকি?'

ছোটমাসি বললেন—'আরে কাঁদব কি। ঐ সোনাঝুরিতেই ছিলাম সে বছরটা—রোজ রোজ পিক্‌নিক্ পড়াশুনোর বালাই নেই, মহানন্দে কেটেছিল সারা বছর, তারপর দাদুর তাড়ায় আবার সব ভর্তি হলাম। সকলের একটা করে বছর নষ্ট হল। কেউ কাঁদিনি।'

পরীদের কথাটা সত্যি মিথ্যা কে জানে কিন্তু সোনামুনি, হাসি, রত্না সবাই ওপরের ক্লাশে উঠে যাবে, কুমু পড়ে থাকবে, ভাবলেও কান্না পায়। তার চেয়ে মরে গেলে কেমন হোত? ধাই মা বলত, 'বিষ্টির জলের ফোঁটা যেমন করে পুকুরের জলের সঙ্গে টুপ করে মিশে যায়, মরে গেলে মানুষের আত্মা ঐ রকম করে ভগবানের সঙ্গে মিশে যায়।'

কুমুর বড় বোন সীমা রেগে যেত। বলত—কি যে বল, সকলের আত্মা এক সঙ্গে কখনো মিশতে পারে? ও বাড়ির দুষ্টু জগার সঙ্গে ভগবান কখনো মিশতে পারেন? আমরাই মিশি না। ঝোপের

আড়ালে বিড়ি খায়, এমনি দুষ্টু ছেলে।'

তবে, ধাই মা নিশ্চয়ই মিশে গেছে। ধাইমা বড় ভালো ছিল।

কুমুর চোখ ঝাপসা হয়ে আসে।

সোনাঝুরিতে দিদ্মার বাড়ির দোতলার বড় ঘরে, মস্ত জানলার ধারে আরাম-চেয়ারে বসে বসে চেয়ে দেখে দূরে একটা বিল, সেখানে হাজার হাজার বৃষ্টির জলের ফোঁটা পড়ছে আর অমনি বিলের জলে মিশে যাচ্ছে। মনে হল জলগুলো যেন নাচছে, লাফাচ্ছে, বড় খুশি হচ্ছে। আস্তে আস্তে পাটা আবার একটু তুলতে চেষ্টা করে কুমু। এমন সময় লাটু এসে ঘরে ঢুকল।

'ও কি হচ্ছে রে? ঠ্যাং তুলছিস্ কেন? ল্যাংড়ারা বুঝি ঠ্যাং তোলে?'

কুমুর চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল বেরোয়। লাটু বিরক্ত হয়ে বলে—'ছি, ছি, ছি; ছিঁচকাঁদুনি!' বলে এক দৌড়ে পালায়।

সন্ধ্যে হয়ে আসছে, বৃষ্টি থেমে গেছে, বিলের জল সাদা চকচক্ করছে। দিদ্মা বলছেন ওটা সত্যিকার বিল নয়, এখানকার লোকেদের শুকনোর সময় বড় জলের কষ্ট, তাই পাথরের ছোট বাঁধ দিয়ে ঝরনার জল ধরে রেখেছে।

আকাশ থেকে হঠাৎ ছায়ার মতো কি বিলের ওপর নেমে এল। কুমু দেখে ঝাঁকে ঝাঁকে সাদা ফিকে ছাই রঙের বুনো হাঁস ঝুপঝাপ করে জলে নামছে। সন্ধ্যের আগের কম আলোতে মনে হচ্ছে যেন রাশি রাশি শুকনো পদ্মফুল সমস্ত বিলটাকে প্রায় ঢেকে ফেলেছে।

এক ছড়া কি যেন সাদা ফুল হাতে নিয়ে লাটু এসে বললে—'ঐ দ্যাখ, বুনো হাঁসরা আবার এসেছে। শিকারীদের কি মজা! ইস্, আমার যদি একটা এয়ারগান থাকত! টপটপ্ গুলি করে মেরে, ঠ্যাং ধরে ঝুলিয়ে নিয়ে আসতাম, তাপ্পর ক্যায়সা খ্যাঁট হোত, ভেবে দ্যাখ্ একবার। ও কি, চোখ বুঁজছিস যে?'

কুমু বললে—'বন্দুক নেই ভালোই হয়েছে। অমন সুন্দর পাখিও

মারতে ইচ্ছে করে!'

দিম্মাও তখন ঘরে এসে বললেন—'হঁ্যা, ওদের ঐ এক চিন্তা, শুধু খাই আর খাই। ওর বাবাও তাই; পঁচিশ-তিরিশটা করে মেরে আনবে, তারপর ভাজো আর খাও।'

কুমু বললে—'কোত্থেকে এসেছে ওরা?'

'যেই শীত পড়ে অমনি উত্তরের ঠাণ্ডা দেশ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসে, বাঁধের কাছে দু-তিন দিন বিশ্রাম করে, তারপর আবার দক্ষিণ দিকে উড়ে যায়, শোনা যায় নাকি সমুদ্রের ওপর দিয়ে আন্দামান অবধি উড়ে যায় কেউ কেউ।'

লাটু কাছে এসে ফুলটা কুমুর খাটে রেখে বললে—'আবার শীতের শেষে যেই না দখ্‌নে বাতাস বয়, অমনি ঝাঁকে ঝাঁকে সব ফিরে আসে, সে কথা তো বললে না ঠাকুরমা? দু-বার শিকারীরা পটাপট গুলি চালায়, আর মজা করে কুড়মুড়িয়ে বুনোহাঁস ভাজা খায়।'

লাটুর কথার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দূরে দুম্ দুম্ করে বন্দুকের গুলির শব্দ হল, আর বুনো হাঁসের ঝাঁক জল ছেড়ে আকাশে উড়ে খুব খানিকটা ডাকাডাকি করে আবার জলে নামল। দু-তিনবার এই রকম হল, তারপরে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল, শিকারীরাও ঘরে ফিরল, পাখির ঝাঁক সেদিনের মত নিশ্চিন্ত হল।

দিম্মার পুরনো চাকর রঘুয়া কুমু-লাটুর জন্য গরম লুচি, মুর্গির স্টু আর ঘন দুধ নিয়ে এল। লাটু মহা খুসি; কিন্তু মুর্গির স্টু আর কুমুর গলা দিয়ে নামে না! বললে—দিম্মা, পাখিরা এখন কি করছে?'

লাটু একগাল লুচি মুখে নিয়ে বললে—'করবে আবার কি, ডানার মধ্যে মুণ্ডু গুঁজে মি-মি কচ্ছে, তাও জানিস নে?'

কুমু ছোটবেলায় ঘুমোনোকে বলত মি-মি কচ্ছে। তাই নিয়ে লাটুর ঠাট্টা হচ্ছে। কি খারাপ লাটুটা!

আরো রাত হ'লে ফুটফুটে চাঁদ উঠল। ঘরের ওপাশে লাটু ছোট

একটা নেওয়ারের খাটে শোয়ামাত্র ঘুমে অচেতন, কিন্তু নতুন জায়গায় এসে কুমুর চোখে ঘুম নেই। খালি মনে হয়, জানলার নিচে সরবতি লেবুর গাছে কিসের যেন ডানা ঝট্‌পট্‌ শুনতে পাচ্ছে। খাটের পাশেই জানলা, কিন্তু যাবার আগে কুমুর ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে দিদ্মা জানলা বন্ধ করে, ভারি পর্দা টেনে দিয়ে গেছেন। কুমু বিছানা ছেড়ে পর্দার পেছনে সেঁধিয়ে গেল!

মস্ত জানলার একটা কাঁচ আবার ছোট্ট একটা জানলার মতো আলাদা করে খোলা যায়, তাই দিয়ে মাথা গলিয়ে কুমু দেখতে চেষ্টা করে। চাঁদের আলোয় গাছের পাতা ঝিক্‌মিক্‌ করে, দোলে, নড়ে; কিন্তু কিছু দেখতে পায় না কুমু, শুধু কানে আসে পাখির ডানার ঝট্‌পটানি। কেমন যেন মন কেমন করে, মাকে দেখতে ইচ্ছে করে, আস্তে আস্তে বিছানায় ফিরে এসে বালিশে মুখ গুঁজে কুমু ঘুমিয়ে পড়ে।

পরদিন সকালে জানলা খুলে, পর্দা টেনে দিদ্মা চলে গেলে, কুমু জানলা দিয়ে চেয়ে দেখে সরবতি লেবুগাছের পাতার আড়ালে, ডাল ঘেঁষে কোনোমতে আঁকড়ে-পাকড়ে বসে রয়েছে ছোট ছাই রঙের বুনো হাঁস। সরু লম্বা কালো ঠোঁট দু-টো একটু হাঁ করে রয়েছে, পা দু-টো একসঙ্গে জড়ো করা, বুকের রংটা প্রায় সাদা, চোখ দু-টো একেবারে কুমুর চোখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে, কালো মখমলের মতো দু-টো চোখ। একদিকের ডানা একটু ঝুলে রয়েছে, খানিকটা রক্ত জমে রয়েছে, সমস্ত শরীরটা থরথর করে কাঁপছে।

পাখিটাকে দেখে কুমুর গলার ভেতরে টন টন করতে থাকে। হাত বাড়িয়ে বলে—'তোমার কোনো ভয় নেই, কোনো ভয় নেই!' পাখিটা চোখ বন্ধ করে, আবার খোলে। আরেকটু ডাল ঘেঁষে বসে।

কানের কাছে লাটু বলে—'ও কি রে, ভোর বেলাতে ল্যাংড়া ঠ্যাং নিয়ে কি হোচ্ছে বল দিকিনি।'

চমকে ফিরে, দু-হাত মেলে জানলাটাকে আড়াল করতে চেষ্টা করে, কুমু হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে—'না, না, ওকে খাবে না।'

লাটু তো অবাক। 'কি আবার খাবে না?' কুমুর কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি মেরে পাখি দেখতে পায়। 'ইস্! ডানায় গুলি লেগেছে বেচারার! দাঁড়া, গাছে চড়ে ধরি ওটাকে।'

সিংহের মতো জোর আসে কুমুর গায়ে। দু-হাত দিয়ে লাটুকে ঠেলে বলে—'কক্ষনো না, কক্ষনো না! ওকে খেতে দেব না!' বলে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে। লাটু ওর খাটের ওপর বসে পড়ে বোকার মতো চেয়ে থাকে। তারপর বলে—'চুপ, হলুদ দিয়ে বেঁধে দিলে সেরেও যেতে পারে। বলিস্ তো ধরে আনি।'

কুমু বললে—'কিন্তু দিম্মা কি বলবেন?'

'কি অবার বলবেন? বলবেন ছি, ছি, ছি, নোংরা জিনিস ফেলে দে, ওসব কি বাঁচে!'

কুমু জোর গলায় বললে—'নিশ্চয় বাঁচে, চুন-হলুদ দিয়ে ডানা বেঁধে, গরম জায়গায় রাখলে নিশ্চয় বাঁচে!'

লাটু বললে—'কোন্ গরম জায়গায়?'

'কেন আমার বিছানায়, লেপের মধ্যে।'

'দেখিস, কেউ যেন টের না পায়।'

'কি করে টের পাবে, আমার বিছানা তো আমি নিজে করি। ডাক্তার আমাকে হাত-পা চালাতে বলেছে যে। আচ্ছা, ধরতে গেলে উড়ে পালাবে না তো?'

'তোর যেমন বুদ্ধি! এক ডানায় ওড়া যায় নাকি?'

'কি খাবে ও, লাটু?'

লাটু ভেবে পায় না খাটের মধ্যে বিছানার ভিতরে কি খাওয়াবে ওকে। তাহলে কি হবে? না খেয়ে যদি মরে যায়!

'এক কাজ করলে হয় না রে কুমু? তোর খাবারের ঝুড়ি দিয়ে, লেবুগাছের ডালে ওর জন্য একটা বাসা বেঁধে দিই, তাহলে ভাঙ্গা ডানা নিয়ে আর পড়ে যাবে না, নিজেই পোকামাকড় ধরে খাবে।'

নিমেষের মধ্যে ঝুড়ি নিয়ে লাটু জানলা গলে একেবারে লেবু

গাছের ডালে। ভয়ের চোটে পাখিটা পড়ে যায় আর কি! লাটু তাকে খপ করে ধরে ফেলে কিন্তু কি তার ডানা ঝট্‌পটানি, ঠুকরে ঠুকরে লাটুর হাত থেকে রক্ত বের করে দিল। লাটু দড়ি দিয়ে শক্ত করে ঝুড়ি বেঁধে পাখিটাকে আস্তে আস্তে তার মধ্যে বসিয়ে দিল। অমনি পাখিটা আধমরার মতো চোখ বুজে ভালো ডানাটার মধ্যে ঠোট গুঁজে দিল।

লাটু সে জায়গাটাতে নিজের পা কাটার সময়কার হলদে মলম লাগিয়ে দিয়ে আবার জানলা গলে ঘরে এল। বললে—'ঠাকুরমার কাছে যেন আবার বলিস্ টলিস্ না। বড়রা বুনো জানোয়ার দেখলে ভয় পায়। বলবেন হয় তো, ছুঁস না ওটাকে। বলা যায় না তো কখন কি বলেন না বলেন!'

কুমু বালিশের তলা থেকে স্ক্রু দেওয়া নতুন পেনসিলটা লাটুকে দিতে গেল।

লাটু বললে—'ধ্যাৎ! বোকা! ঠ্যাং ল্যাংড়া বলে কি বুদ্ধিও ল্যাংড়া না কি!' বলে এক ছুটে পালিয়ে গেল।

কুমু পা ঝুলিয়ে খাটে গিয়ে বসল।

পাখিটাও ল্যাংড়া। ওর ডানা ল্যাংড়া। কুমু হাঁটতে পারেনা ভালো করে, পাখিটাও উড়তে পার না। পারলে নিশ্চয় ঐ দূরে বিলে ওর বন্ধুদের কাছে চলে যেত। গাছের ডালে খাবারের ঝুড়িতে ডানায় মুখ গুঁজে চুপ করে পড়ে থাকত না। কুমুর পা ভাল হলে কুমুও এখানে থাকত না। কলকাতায় মার কাছে থাকত, রোজ ইস্কুলে যেত, সন্ধ্যেবলায় সাঁতার শিখত, পুজোর সময় দৌড় খেলার জন্য রোজ অভ্যাস করত। আর কোনো দিনও হয় তো কুমু দৌড়তে পারবে না। কিছুতেই আর পায়ে জোর পায় না, মাটি থেকে ঐ এক বিঘতের বেশি তুলতে পারে না। মনে হয় অন্য পাটার চেয়ে এটা একটু ছোট হয়ে গেছে।

আরেকবার জানলার কাছে গিয়ে পাখিটাকে দেখে ভালো করে, ও

ডানাটাকে যে নাড়া যায় না সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। পাখিটা ঝুড়িতে বসে বসে আস্তে আস্তে কালো ঠোঁট দিয়ে বুকের পালক পরিষ্কার করছে। তারপর কিছুক্ষণ ঠোঁটে ভর দিয়ে চুপ করে চোখ বুজে পড়ে থাকল। তারপর আবার চোখ খুলে গাছের ডাল থেকে কি একটা খুঁটে খেল।

কুমু বালিশের তলা থেকে ছোট্ট বিস্কুটের বাক্স থেকে একটুখানি বিস্কুট ছুঁড়ে দিল। পাখিটাও অমনি যেমন পাথর হয়ে জমে গেল। বিস্কুটের দিকে ফিরেও চাইল না। কুমু আবার খাটে এসে বসল, নতুন গল্পের বইটা পড়তে চেষ্টা করল। পনেরো মিনিট বাদে আরেকবার জানলা দিয়ে উঁকি মারল। বুকের পালক পরিষ্কার করতে করতে পাখিটা আবার কি একটা খুঁটে খেল।

কুমু খাটে ফিরে এল। খাটের পাশেই আয়না দেওয়া টেবিল, তার টানা থেকে মেজমাসির দেওয়া নীল রেশমী ফিতেটা বের করে চুল বাঁধল। বাঃ বেশ তো ফিতেটা। একটা বিস্কুট বের করে মুখে দিল, চমৎকার বিস্কুট, কিসমিস্ দেওয়া। আরো খানিকটা বাদে যখন একটা বড় খুঞ্চিতে করে রঘুয়া কুমুর দুধ, পাঁউরুটি, নরম নরম ডিম সিদ্ধ নিয়ে এলো, তাতে নুন গোলমরিচ দিয়ে কুমু চেটেপুটে খেয়ে ফেলল। এতটুকু রুটি, এককোঁটা দুধ বাকি থাকল না। রঘুয়া তো মহা খুশি।

'আমি বরাবর বলি বড়মাকে এখানকার হাওয়াই আলাদা। বলে নাকি কুমুদিদির খিদে হয় না, ঐ তো কেমন সব খেয়ে ফেলেছে।'

রঘুয়া চলে গেলে পর ঘরটা আবার চুপচাপ হয়ে গেল। লাটু নিচে মাস্টারমশাই-এর কাছে পড়েছে, দিম্মা রান্নাঘরে, লাটু সকাল সকাল ভাত খেয়ে ইস্কুলে যাবে।

খনিক বাদে দিম্মা উপরে এসে ভারি খুশি।

'এই তো দিদিমণি কেমন চুল আঁচড়ে নীল রিবন বেঁধেছে, খুব ভালো দেখাচ্ছে। আবার খিদেও হয়েছে শুনছি। বাড়িতে নাকি কান্নাকাটি করত, খেত না? কেমন ভালো জায়গাটা বলতো? তাই

লোকে বলে এটা পরীদের দেশ, ঐ বাঁধটাকে বলে পরীতলা।'

গাছের ডালে পাখিটা একটু নড়ছে চড়ছে, একটু-একটু শব্দ হচ্ছে, কুমু ভয়ে কাঠ, এই বুঝি দিম্মা দেখতে পেয়ে মঙ্গলকে বলেন, 'ফেলে দে ওটাকে, বড় নোংরা, ঝুড়ি খুলে আন, ওটা কে বেঁধেছে ওখানে, ভালো ঝুড়ি!'

ঘরের মধ্যে টুকিটাকি দু'একটা কাজ সেরে দিম্মা গেলেন চলে। কুমু জানলা দিয়ে চেয়ে দেখে পাখিটা ডানার মধ্যে মুণ্ডু গুঁজে ঘুমিয়ে আছে। কুমুও বই নিয়ে বিছানায় গিয়ে শুল। হঠাৎ জানালার বাইরে সোরগোল। চমকে উঠে দেখে একটা হলদে বেড়াল গাছের ডালে গিয়ে উঠেছে। কুমু ভয়ে কাঠ, এই বুঝি বেড়াল পাখি খেল। কিন্তু খাবে কি, অত বড় পাখি তার তেজ কত! দিলে ঠুক্‌রে ঠেলে বেড়ালের মুখ থেকে রক্ত বের করে দিয়ে একবারে ভাগিয়ে। দু-টো কাক দূর থেকে মজা দেখল, কাছে ঘেঁষতে সাহস পেল না।

কুমু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ঘরের এমাথা থেকে ওমাথা হেঁটে বেড়াতে লাগল। খোঁড়া তো হয়েছে কি, এইরকম করে হাঁটলেই না পায়ের জোর বাড়বে। দু'বার হেঁটে কুমু এসে যখন খাটে বসল, পা দু-টোতে ব্যথা ধরে গেছে, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন ডান পাটা এক বিঘতের চেয়ে একটু বেশিই তোলা যাচ্ছে।

দিম্মা এলে কুমু বললে—'স্নানের ঘরে আমার জামা তোয়ালে তুমি ঠিক করে দিও; আমি নিজেই স্নান করব।'

দিম্মা ব্যস্ত হয়ে বললেন—'আজ অনেক হেঁটেছে, আজ থাক, দু-দিন বাদে কোরো, কেমন?

এমনি করে দিন যায়, বুনো হাঁসের ডানা আস্তে আস্তে সারতে থাকে। দু-দিন পরে পাখির ঝাঁক বিল থেকে দক্ষিণ দিকে উড়ে গেল। গাছের ডালে বসে পাখিটা একটা ডানা ঝাপটাতে লাগল। উড়বার জন্য কি যে তার চেষ্টা! কিন্তু ভাঙ্গা ডানা ভর সইবে কেন, হাঁসটা ঝুড়ি থেকে পিছলে পড়ে নিচের ডালের ফাঁকে আটকে

থাকলো। লাটু তখনো ইস্কুল থেকে ফেরেনি, কুমু করে কি! জানলার ধারে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকলো। পাখিটা অনেকক্ষণ অসাড় হয়ে ঝুলে থাকার পর আঁচড়েপাঁচড়ে নিজেই সেই ডালটার উপর চড়ে বসল। লাটু ফিরে এসে আবার ওকে তুলে ঝুড়িতে বসিয়ে দিল। ঠোকরালও একটু সে, তবে তেমন কিছু নয়, ডানায় আবার ওষুধ লাগিয়ে দিল লাটু।

পরদিন কুমু লাটুর সঙ্গে মাস্টারমশাই-এর কাছে পড়তে বসল। মাস্টারমশাই উপরে এলেন—কি ভালো উনি, কুমুকে বেশি করে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। বললেন, এমনি মন দিয়ে পড়লে উনি কুমুকে এই তিনমাসে এমন করে তৈরি করে দেবেন যে বছরের শেষে পরীক্ষা দিয়ে কুমু দিব্যি উপরের ক্লাশে উঠে যেতে পারবে।

এমনি করে দিন যায়, রোজ পাখি একটু করে সেরে ওঠে, ঝুড়ি থেকে ডালে নামে। আর আনন্দের চোটে কুমুও ঘরময় হেঁটে বেড়ায়, নিজের বিছানা নিজে পাতে, নিজে স্নান করে, জামা কাচে। দুপুর বেলা এক ঘুম দিয়ে উঠে নিজে বসে অঙ্ক কষে। বাড়িতে চিঠি লেখে —"মা বাবা, তোমরা ভেবোনা, আমি রোজ রোজ সেরে উঠছি, আমার নতুন ফ্রকগুলো পাঠিয়ে দিও, রত্নাদের বলো—আমি পরীক্ষা দেব, আমি আরেকটু ভালো হলে নিজে নিচে নামব, এখন আমাকে রোজ বিকালে কোলে করে বাগানে নামায়, সরবতি লেবুগাছের তলায় বেতের চেয়ারে বসিয়ে দেয়। রাতে আমি নিচে সবার সঙ্গে খাই।"

আরো লিখেছিল—"সরবতি লেবুগাছে একটা বুনো হাঁস থাকে, তার ডানা ভেঙ্গে গেছিল, এখন সেরে যাচ্ছে।" কিন্তু সেটা আবার কেটে দিল, জানতে পেরে যদি দিম্মা পাখিটাকে তাড়িয়ে দেন!

এমনি করে এক মাস কাটল। তার মধ্যে একদিন খুব বৃষ্টি হয়েছিল, পাখিটাতো ভিজে চুপ্পুড়। ঝুড়ি ছেড়ে ঝুড়ির তলার গাছের ডালের আড়ালে গিয়ে সেঁধুল। তারপর বৃষ্টি থেমে আবার যখন রোদ উঠলো, দিব্যি ডানা মেলে পালক শুকোল। কুমু অবাক হয়ে

দেখল ডানা সেরে গেছে।

তার দু-দিন পরে পাখিটা উড়ে গেল। দুপুরে শুকনো ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে, মাথার অনেক ওপর দিয়ে মস্ত এক ঝাঁক বুনো হাঁস তীরের মত নক্সা করে উড়ে গেল। কুমুর পাখিও হঠাৎ কি মনে করে ডাল ছেড়ে অনেকখানি উঁচুতে উড়ে গেল, কিন্তু তখনি আবার নেবে এসে মগডালে বসল। হাঁসরা গিয়ে পরীতলায় নামল। পাখি সেই দিকেই চেয়ে থাকল।

সারা রাত বুনো হাঁসরা বিশ্রাম করে পরদিন সকালে যখন দল বেঁধে আকাশে উড়ল, কুমুর পাখিও তাদের সঙ্গে নিল। দল থেকে অনেকটা পেছিয়ে থাকল বটে, কিন্তু ক্রমাগত যে রকম উড়তে লাগল কুমু লাটুর মনে কোন সন্দেহ রইলো না, এখুনি ওদের ধরে ফেলবে।

সে বিকেলে কুমু নিজে হেঁটে নিচে নামল, ডান পাটা যেন একটু ছোটই মনে হল।

কুমু বলল—"দিম্মা, পাটা একটু ছোট হলেও কিছু হবে না, আমি বেশ ভালো চলতে পারি। বুনো হাঁসটারও একটা ডানা একটু ছোট হয়ে গেছে।'

শুনে দিম্মা তো অবাক! তখন লাটু আর কুমু দু-জনে মিলে দিম্মাকে পাখির গল্প বললে। দিম্মা কুমুর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন —'ওমা, বলিসনি কেন, আমিও যে পাখি দেখতে ভালোবাসি!'



বাঁদুরে বিচার

আমার বাবা জরীপ বিভাগে কাজ করতেন। সেকালে ভারত, বর্মা, শ্যামদেশের মানচিত্র তৈরি হচ্ছে, তাই বাবাকে ও-সব জায়গার ঘন বনে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করতে হত। তখনকার শ্যাম দেশ হল এখনকার থাইল্যাণ্ড।

বাবার সঙ্গে সর্বদা বন্দুক টোটা থাকত, কিন্তু তিনি জন্তু-জানোয়ারদের বড়ই ভালোবাসতেন। আত্মরক্ষার জন্যে, যখন সঙ্গের লোকজনদের রসদ প্রায় ফুরিয়ে আসত তখন ছাড়া বাবা জানোয়ার মারতেন না। নিজে নিরামিষ খেতেন। বনে ঘোরা যার কাজ, সে জানোয়ারদের হাবভাব আর জীবনযাত্রার ধরন লক্ষ্য করবার অনেক সুযোগ পায়। বাবাও জীবজন্তুদের বিষয়ে অনেক কিছু লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি বলতেন, 'সব জাতের জানোয়ারের জীবনধারা এক রকম নয়। কোনো কোনো জন্তুর ছোট ছোট পরিবার আলাদা ভাবে থাকে।

মা বাবা কয়েকটা বাচ্চা। আবার কেউ দল বেঁধে থাকে। সাধারণতঃ তাদের একজন করে দলপতি থাকে। তার হুকুম মেনে সবাই চলে। না চললে তার দলে টেকা দায় হয়ে ওঠে।'

একবার অনেক দিন ধরে লোকালয় থেকে বহু দূরে, ঘোর জঙ্গলে

জরীপের কাজ করে, অবশেষে বাবা তাঁর দলবল নিয়ে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে সালওয়েন নদীর একটা শাখার তীরে পৌঁছলেন। ক্লান্তিতে সকলের শরীর ভেঙে পড়ছে।

কাছেই একটা ছোট গ্রাম আর নদীর ধারে সরকারী অফিসারদের থাকবার জন্য একটা বাংলো। এত দিন পরে ঘরবাড়ি, মানুষজন, দোকান-হাটে তাজা তরি-তরকারি মাছ দেখে সকলে আহ্লাদে আটখানা! বনের মধ্যে সপ্তাহের পর সপ্তাহ শুধু ভাত ডাল শুকনো আলু আর লংকা খেয়ে ওদের কাটাতে হয়েছিল। বাবা নিজেও খুব খুশি।

স্নান সেরে বাংলোর জালে ঘেরা চওড়া বারান্দায় একটা আরাম চেয়ারে বসে বাবার মনে হতে লাগল যে নদীর ধার থেকে একটা হট্ট-গোলের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন। এমন সময় বাবার রান্নার লোক শশী ছুটে এসে বলল, 'স্যার, একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে চান তো আসুন।'

তাড়াতাড়ি নদীর ধারে গিয়ে, বাবা অন্য তীরের একটা বুড়ো বটগাছের দিকে তাকালেন। সকলের চোখ সেদিকে। বটগাছের ডালে ডালে সারি সারি লালমুখো বাঁদর বসে আছে। ধাড়িগুলো ওপরের ডালে, পশুরা তার নিচে। কোনো ঠেসাঠেসি খামচাখামচি নেই, ভদ্রলোকের মতো সবাই বসে, ঠিক যেন মিটিং করতে এসেছে। কেউ নড়ছে-চড়ছেও না। মনে হল কিছুর জন্য তারা অপেক্ষা করছে।

মাঝারি মাপের বাঁদর সব, লালচে লোম গায়ে। মগ্‌ডালে এক বুড়ো বাঁদর বসে ছিল। গায়ের লোম পেকেছে, অনেক জায়গায় উঠেও গেছে। ল্যাজের অর্ধেকটা খোয়া গেছে। কোঁচকানো মুখটা একজন বিজ্ঞ বিচক্ষণ বুড়োর মুখের মতো।

অন্য বাঁদররা একবার তার দিকে তাকাচ্ছে, একবার চোখ ফিরিয়ে একটু নিচের ডালে বসা এক ছোকরা বাঁদরকে দেখছে। সে বেচারাকে দুটো ষণ্ডা বাঁদর শক্ত করে ধরে রেখেছে।

বুড়ো বাঁদর হঠাৎ খক্-খক্ করে কি যেন হুকুম দিল। শুনে বন্দী

বাঁদর আঁৎকে উঠল। অন্য বাঁদররাও কি সব বকতে বকতে উত্তেজিত ভাবে গাছ থেকে নেমে পড়ল। দুই ষণ্ডা বন্দীকে নামাল। কোনো রকম আপত্তি করবারও তার মনের জোর আছে বোধ হল না। ষণ্ডারা তার দুই হাত আর দুই ঠ্যাং ধরে ঝুলিয়ে নদীর কিনারায় নিয়ে গেল। তারপর মোক্ষম একটা দোল দিয়ে ছুঁড়ে মাঝ-নদীতে ফেলে দিল।

সে কি কিচিরমিচির হট্টগোল। বাঁদররা সবাই নদীর ঐ তীরে ভিড় করে এগুতে লাগল। হতভাগাটাকে সাহায্য করবার জন্যে নয়, বরং তীরে উঠবার চেষ্টা করলেই তাকে আবার জলে ঠেলে ফেলবার জন্য। ডুবে যাবার কোনো ভয় ছিল না। সে বাঁদরটা দারুণ সাঁতারু, কিন্তু নিজেদের তীরে তার উঠবার উপায় ছিল না। যতবার চেষ্টা করে, ততবার ধাক্কা খেয়ে জলে পড়ে। এমনি করে নদীর স্রোত ধরে বাঁদরের দল ক্রমে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

বাবা এই কাণ্ড দেখে অবাক্! আশ্চর্যের বিষয়, বাঁদরটা এদিকের পাড়ে উঠবার একবার-ও চেষ্টা করল না। যে দিকে বাধা, বারে বারে সে দিকেই উঠতে চাইছিল। দেখে দেখে বাবার মনে হল ঐ বুড়ো বাঁদরটাই ওদের দলের পাণ্ডা। তার কথার নড়চড় হবার উপায় নেই। ঐ বেচারা নিশ্চয় দলের এমন কোনো বাঁদুরে নিয়ম ভেঙে ছিল, যার ক্ষমা হয় না। তাই এই শাস্তি। প্রাণদণ্ড নয় মোটেই। ওকে কেউ মেরে ফেলার চেষ্টা করেনি। কিন্তু বন্ধুদের দল থেকে ওকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। ও এখন নির্বাসিত।

———